স্পাই টানেল

চিরঞ্জীব সেন

শরৎ পাবলিশিং হাউস
২৪/১ নাবালিয়া পাড়া রোড
কলিকাতা-৭০০০০৮

প্রকাশক :
সত্যেন্দু চ্যাটার্জী

প্রথম প্রকাশ :
৭ই আগষ্ট ১৯৬৫

মুদ্রাকর :
শ্রীসরোজ কুমার রায়
শ্রীমুদ্রণালয়
১২, বিনোদ সাহা লেন
কলিকাতা ৭০০০০৬

প্রচ্ছদ :
কুমার অজিত

শ্রীমান সুকুমার মুখোপাধ্যায়কে

—চিরঞ্জীব সেন

আমাদের প্রকাশিত লেখকের বই

খুনী জাহাজ—সাত টাকা

সে ১৯৫৪ সালের কথা। সে দিনের আবহাওয়াটাও বেশ চমৎকার, না শীত, না গরম। লিণ্ডেন গাছে ফুল এসেছে, মাঝে মাঝে হাওয়া বইছে।

রাইখ্‌স্‌টাগ অধিকৃত বার্লিনের এক প্রান্তে ছোট একটি অফিস ঘর। অফিসের একমাত্র মালিক অফিসে ঢুকে কোট খুলে হ্যাঙারে টাঙিয়ে রেখে একটা সিগারেট ধরাল। সিগারেটটা আমেরিকান। বার্লিনের দেওয়াল পার হয়ে এপারে মাঝে মাঝে চলে আসে।

মালিকের নাম অটো বাওয়ার। সিগারেট টানতে টানতে চোখ বুজে বাওয়ার কি ভেবে নিলেন তারপর একটা টেলিফোন করলেন। টেলিফোনের অপর প্রান্তে একজন সাড়া দিয়ে বললেন,

গুটেন মর্গেন, হাউপ্টম্যান হিয়ার

গুটেন মর্গেন, হেয়র হাউপ্টম্যান, আমি অটো বাওয়ার বলছি, সেই নমুনাগুলোর কথা বলছিলুম, সেগুলো নিয়ে যদি আমার অফিসে আসেন তো আমরা এ বিষয়ে কথা বলতে পারি, হ্যাঁ, আমার সঙ্গে কথা বললেই হবে।

ঘণ্টাখানেক পরে একখানা রাশিয়ান গাড়ি চালিয়ে হাউপ্টম্যান এসে হাজির। সঙ্গে নমুনা এবং কিছু কাগজপত্র এনেছে। ইতিমধ্যে বাওয়ারের অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং একজন প্লাস্টিক এক্সপার্টও এসে গেছে। হাউপ্টম্যান আসার পর কফি এল এবং সকলে মিলে ব্যবসায়িক কথাবার্তা শুরু হল। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ধরে কথাবার্তা চলল। মাঝে আরও এক রাউণ্ড কফি পরিবেশিত হল।

হাউপ্টম্যান এক বোতাম কম্পানির প্রতিনিধি। বোতাম সরবরাহ নিয়েই কথাবার্তা হচ্ছিল আর কি। হাউপ্টম্যান যখন কথাবার্তা সেরে উঠল তখন তার পকেটে বোতাম সরবরাহের একটা মোটা কণ্ট্রাক্ট এসে গেছে। কণ্ট্রাক্টের সমস্ত শর্তাবলী এবং অন্যান্য বিবরণী স্পষ্ট করে লিখে দেওয়া হয়েছে। কণ্ট্রাক্টটি একটি খামে ভরে মুখ বন্ধ করে হাউপ্টম্যানের হাতে দিয়ে অটো বাওয়ার বার বার বলে দিল, মন দিয়ে ভাল করে পড়ে দেখো।

নিজের অফিসে ফিরে হাউপ্টম্যান কণ্ট্রাক্টখানা পকেট থেকে বার করল না। সে সেটি তার ব্যক্তিগত ব্রিফকেসের মধ্যে রেখে দিল। রাত্রে বাসায় ফিরে ডিনার সেরে নিজের ছোট্ট স্টাডিতে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর ব্রিফকেস থেকে সেই কণ্ট্রাক্টখানা বার করল। খাম খুলে ভেতর থেকে টাইপ করা কাগজগুলো বার করল। ঘরের আলো নিবিয়ে একবার বাইরে এল। বারান্দা থেকে রাস্তার দিকে ভাল করে কি যেন দেখল। তারপর আবার ঘরে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে হাতে পেনসিল নিয়ে কণ্ট্রাক্টের কাগজগুলো পড়তে লাগল।

বোতাম সাপ্লাইয়ের সাধারণ একটা কণ্ট্রাক্টে কি থাকতে পারে যে হাতে পেনসিল নিয়ে দরজা বন্ধ করে গোপনে সেটি পড়তে হবে? আছে বই কি, কিছু আছে নিশ্চয়।

হাউপ্টম্যান যা গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ছিল ও মাঝে মাঝে পেনসিল দিয়ে দাগ দিচ্ছিল সে সবই সাংকেতিক ভাষায় অর্থাৎ কোডে লেখা। ভাল করে পড়ে নিয়ে সে মূল বিষয় উদ্ধার করে আলাদা কাগজে পরিষ্কার করে লিখল। সেটিকে সংশোধন করে আবার লিখল। লেখা শেষ হতে রাত্রি বারোটা বেজে গেল।

হাউপ্টম্যান এই যে পাঠোদ্ধার করে যা লিখল তা তার কা[illegible] প্রয়োজনীয় কিছু নয়। কিন্তু অন্যত্র এটি বিশেষ প্রয়োজনীয়।

অন্যত্র মানে আরও একটি পাইকারি ব্যবসায়ের অফিস অ[illegible]

সে অফিস জার্মানির বাইরে, দক্ষিণ ফ্রান্সে মার্সেলসে। কয়েকদিন পরে সেই অফিসের ম্যানেজার হাউপ্টম্যানের কাছ থেকে একখানি চিঠি পেলেন। চিঠিব বিষয়বস্তু হল কিছু মাল সস্তা দরে বিক্রয় কবার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

এই চিঠিখানিই আবাব দেখা গেল এক সপ্তাহ পরে অ্যালেন ওয়েলশ ডালেস-এব টেবিলে। ডালেস তখন ইউনাইটেড স্টেটস সেণ্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সিব ডিরেক্টব। চিঠিখানা যে খামে পাঠান হয়েছিল সেই খামেব ওপর লেখা ছিল 'এডব্লুডি'জ আইজ ওনলি'। চিঠিতে একটি জবর খবর এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রস্তাব ছিল।

বার্লিনের ঠিক বাইবে টেলিফোন কেবেলের একটা টার্মিনাল সেখান আছে। থেকে ইস্ট জার্মানিব সিভিল ও মিলিটারি অফিসাবদের টেলিফোন কনেকসন দেওয়া হয়েছে। এই টাবমিনাল মাবফত এক সঙ্গে চাবশ বত্রিশটা কল যোগাযোগ কবা যায়। এবং এর পবে একটি প্রস্তাব ছিল।

অটো বাওয়ার, হ্যানস হাউপ্টম্যান এবং মার্সেলস অফিসের সেই ম্যানেজার এরা তিনজনেই হল সি আই এ এজেণ্ট। অটো বাওয়ার এবং হ্যানস হাউপ্টম্যান ওদের আসল নাম নয় এবং ওদের নিজস্ব কোন ব্যবসাও নেই। ব্যবসাটা হল জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়ার ভাঁওতা মাত্র।

বাওয়ার একজন পুরনো স্পাই, সি আই এ সৃষ্টি হবার অনেক আগে থেকেই সে এই বৃত্তিতে ডুবে আছে। দু এর দশক থেকে সে জার্মান নাগরিক। ব্রিটিশ ইনটেলিজেনস্ দপ্তর তাকে বার্লিনে পাঠিয়েছিল। তখন সে নবীন যুবক। ছোটখাটো একটা ম্যানুফ্যাকচারিং ব্যবসা করবার জন্যে ব্রিটিশ সবকার তাকে কিছু টাকাও দিয়েছিল।

জার্মানিতে এসে গুছিয়ে বসতেই তার পাঁচ বছর লেগেছিল। এই

পাঁচ বছর সে প্রায় নিষ্ক্রিয় ছিল। ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্স দফতরও তাকে তৈরি হতে সময় দিচ্ছিল। ভাল স্পাই রাতারাতি তৈরি হতে পারে না, সময় লাগে।

পাঁচ বছর পার হল এবং বাওয়ারও যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল। গোপন খবরের পর খবর পাঠাতে লাগল বাওয়ার। ভাইমার রিপাবলিকের কত খবর, হিটলারের ও নাৎসী পার্টির উত্থান, পোল্যাণ্ড আক্রমণের ভূমিকা, জার্মানির ওয়ার প্ল্যান, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক আগে জার্মানির মতলব, এইসব নানারকম খবর বাওয়ার সরবরাহ করতে লাগল।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিক থেকে বাওয়ার তার পুরনো মনিবদের ত্যাগ করে অ্যামেরিকার স্পাই হয়ে গেল। ইস্ট জার্মানিতে বাওয়ার একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসাবে খ্যাতি লাভ করল। কিন্তু মূল কাজ সে কোনোদিন ভোলে নি বা উপেক্ষাও করে নি ওয়াশিংটনে নিয়মিত খবর পাঠিয়ে যাচ্ছে।

টেলিফোন টারমিনালের ব্যাপারটা সি আই এ চিফের মাথায় সঙ্গে সঙ্গে ঢুকল এবং অবিলম্বে কাজ আরম্ভ করে দেওয়া হল। প্রথমে খোঁজ খবর। মাস তিনেক লাগল। বাওয়ার যে প্ল্যান দিয়েছে তা যাচাই করা হল। হ্যাঁ, লাইন ট্যাপ করলে সব কথাই শুনতে পাওয়া যাবে। চমৎকার সুযোগ সোভিয়েট রাশিয়া বার্লিনে তাদের এলাকায় এবং অন্যত্র যে সব খবর পাঠাবে সে সবই শোনা যাবে। ওখান থেকে একটা লাইন নাকি মসকো চলে গেছে। ভালো করে মাটির পাঁচ ফুট নীচে দিয়ে টেলিফোনের তার গেছে।

টারমিনালটা হল সোভিয়েট এলাকায়, অলট গ্রিনিক নামে অ্যামেরিকান জোন থেকে ছ'শো গজ দূরে। এদিকে রুডো নামে গ্রামটা হল অ্যামেরিকান জোনের একেবারে শেষে।

লাইন ট্যাপ করতে হলে ঐ টেলিফোন টারমিনালের কাছে পৌঁছতে হবে। কি করে পৌঁছন যায়? টানেল খোঁড়ো, ছ

গজ টানেল খোঁড়া সোজা কথা নয়। ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবল। গোপনে কাজটা করতে হবে।

কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। রুডো গ্রামে অ্যামেরিকানরা একটা রাডার স্টেশন বসাবে, সেজন্য কয়েকটা বাড়ি তৈরি আরম্ভ হল। একটা বাড়ির ভেতর দিয়েই টানেল খোঁড়াও আরম্ভ হল। বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারছে না ভেতরে কি হচ্ছে। টানেলের মাটি খুঁড়ে সেই বাড়ির ভেতরেই জমা হতে থাকল। কিছু মাটি আবার প্যাকিং বাক্স ভর্তি করে বাইরে অন্য লেবেল বসিয়ে অন্য জাগায় প্রয়োজন মেটাবার জন্যে পাঠান হতে থাকল।

পাঁচ সপ্তাহ কাজ চলবার পর টানেল যখন অনেকটা এগিয়ে গেছে তখন কর্মীরা ওপরে দুমদাম আওয়াজ শুনতে পেল। সর্বনাশ! তারা তো তখনি কাজ বন্ধ করে কর্তাদের জানাল।

ব্যাপারটা কি জানতে হবে তো। কর্তারা একজন ডবল এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করল। ডবল এজেন্ট তার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। শুনেফিল্ড গ্রামের কাছে এসে ডবল এজেন্ট দেখতে পেল কিছু রুশ কর্মী কাজ করছে। সসেজ কেনবার ছল করে ডবল এজেন্ট গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল।

সসেজ কিনে এনে কর্মীদের সঙ্গে সে আলাপ করে জানল যে ওরা মিউনিসিপ্যাল কর্মী, রাস্তার ধারে একটা জলের পাইপ বসাচ্ছে। অতএব ভয় নেই। সেখান থেকে কুড়ি ফুট নীচে টানেল খোঁড়া হচ্ছে।

ডবল এজেন্ট এই খবরটি জানিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার টানেল খোঁড়ার কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। এঞ্জিনিয়ারদের বাহাদুর বলতে হবে। মাত্র চার মাসের মধ্যে তারা টানেল সম্পূর্ণ করে দিল।

সে কি টানেল! যেন নতুন একটা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ তৈরি হয়ে গেল। ছ'ফুট ব্যাস, এয়ারকণ্ডিশন, ইলেকট্রিক আলো, জল বার করবার জন্য পাম্প এসব তো আছেই, টার্মিনালের ৪৩২টা

লাইনের জন্যে ৪৩২টা অ্যামপ্লিফায়ার বসানো হল এবং প্রয়োজন হলে যাতে একসঙ্গে ৪৩২টারই কথা শোনা যায় তারও ব্যবস্থা করা হল।

এসপিওনেজের ইতিহাসে এমন বিরাট ব্যাপার আর কখনও করা হয় নি এবং এমন নিখুঁতভাবে।

টানেলের ভেতর বসে অ্যামেরিকানরা এক বছর ধরে তাদের কাজ করে গেল। রাশিয়ানরা কিছুই টের পেল না। মসকো ও বার্লিন থেকে কত লম্বা লম্বা শব্দের আদান প্রদান হল। প্রতিটি শব্দ, কথা অ্যামেরিকানরা রেকর্ড করল। সেগুলি চলে গেল সি আই এ হেডকোয়ার্টারে। সেখানে অনেক কর্মী। তারা প্রতিটি মেসেজ পরীক্ষা করে সারাংশ করে কর্তাদের জানাতে লাগল। কর্তারা সেগুলি কাজে লাগাতে লাগালেন।

খবর যে কিছু ফাঁস হচ্ছে তা সোভিয়েট কর্তারা বুঝতে পারছে কিন্তু কোথা দিয়ে ফাঁস হচ্ছে ধরতে পারছে না। তারা তাদের সিকিউরিটি ব্যবস্থা কড়া করতে থাকল, ঘন ঘন লোক বদলি করতে লাগল, ছিদ্র পথ বন্ধ করতে লাগল কিন্তু তবুও খবর ফাঁস হয়।

১৯৫৬ সালের ২২জুন। সোভিয়েট সিগন্যাল স্কোয়াডের একজন মেকানিক মাটির নীচে তাদের টেলিফোনের তার চেক করবার জন্যে নীচে নেমে একটা লোহার দরজা দেখতে পায়। দরজার ফাঁক দিয়ে একটা তারও বুঝি বেরিয়ে ছিল কিন্তু দরজায় রুশ ভাষায় লেখা আছে "কমাণ্ডিং অফিসারের আদেশ, প্রবেশ নিষেধ"।

মেকানিক দরজা খোলবার সাহস পেল না। সে প্রবেশ নিষেধের খবর জানাবার জন্যে ওপরে উঠে গেল।

এদিকে মেকানিক বোধ হয় তারটা স্পর্শ করে ছিল বা টেনেছিল। তাতেই টানেলের মধ্যে অ্যালার্ম বেজে উঠেছে এবং অ্যামেরিকানরা সঙ্গে সঙ্গে সরে পড়েছে।

মেকানিক ওপরে উঠে যখন খবর দিল তখন সোভিয়েট কর্তারা

শুনে অবাক। নীচে লোহার গেট? তার? বলে কি? আবার লেখা আছে প্রবেশ নিষেধ! ওদিকে কোথায় যাবে? চল তো দেখি।

টেলিফোন এঞ্জিনিয়াররা নীচে নেমে এল। সত্যিই তো, একটা লোহার দরজা রয়েছে এবং প্রবেশ নিষেধ লেখাও রয়েছে। কিন্তু গেট তো ওদিক থেকে বন্ধ। তখন জোর করে গেট ভাঙ্গা হল।

ওপারে ঢুকে এঞ্জিনিয়াররা তাজ্জব। এই রকম বিরাট ব্যাপার করা হয়েছে! সঙ্গে সঙ্গে খবর গেল সিকিউরিটি বিভাগে। কর্তারা এবার বুঝলেন কি ভাবে খবর ফাঁস হচ্ছিল।

সোভিয়েট এঞ্জিনিয়াররা কিন্তু অ্যামেরিকান এঞ্জিনিয়ারদের তারিফ না করে পারল না। তারা ওয়াশিংটনে প্রতিবাদ পাঠিয়েছিল কিন্তু টানেলটির দখল নিয়ে তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ট্যুরিস্টদের দেখাত এবং সোভিয়েট ও ইস্ট জার্মানীর পত্রিকায় এই স্পাই টানেলের প্রশংসা করে সচিত্র প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৫৬ সালের ৯ই জুন তারিখে টানেলটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সি আই এ কাহিনীর মধ্যে এই বার্লিন টানেল একটি পরিচ্ছেদ মাত্র। সি আই-এর ক্রিয়াকলাপ পৃথিবীব্যাপী, তার ক্ষমতা অসীম, অর্থভাণ্ডার তার অফুরন্ত।

এই স্পাই টানেলের প্ল্যান প্রথম কার মাথায় এল এবং কিভাবে তা রূপায়িত করা হল সে আর এক আশ্চর্য কাহিনী। সে কাহিনীতে পরে আসছি তার আগে সি আই এ-এর একটু পরিচয় দেওয়া যাক।

সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সির সূত্রপাত সেই পার্ল হারবরের দিন যে দিন জাপান অতর্কিতে অ্যামেরিকার নৌঘাঁটি আক্রমণ করল!

১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর রবিবার। শেষ রাত্রি ঘড়িতে তখন প্রায় চারটে। প্রশান্ত মহাসাগরে পার্ল হারবরে অ্যামেরিকার বিরাট নৌঘাঁটি। চারদিক শান্ত। ঘাঁটিতে তখন আছে ন'খানা বড় যুদ্ধ

জাহাজ অর্থাৎ ক্যাপিটাল শিপ, ডেস্ট্রয়ার, ক্রুজার, মাইন সুইপার আরও কত কি। পূরো একটা ফ্লিট।

ঘাঁটির এক প্রান্তে একজন সার্জেন্ট পাহারা দিচ্ছিল। হঠাৎ একটা আওয়াজে আকৃষ্ট হয়ে সে জলের ধারে এসে দেখল একজন লোক জলে সাঁতার কাটছে।

এখানে সাঁতার কাটছে? এই রাত্রে এবং নিষিদ্ধ মিলিটারি এলাকায়। সার্জেন্ট লোকটাকে চ্যালেঞ্জ করল। লোকটা যেন ভয়ে উঠে এল। চেহারা ও পরিচ্ছদ দেখে মনে হল লোকটা একটা জাপানি জেলে। হাতে একটা ছোট জালে কয়েকটা মাছও রয়েছে।

সার্জেন্ট তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করল, উত্তর পেল না। জেলে ইসারায় জানিয়ে দিল যে সে ইংরেজি জানে না। সে জেলে, মাছ ধরতে এসেছিল, এবার ছেড়ে দাও আর কখনও আসব না।

সার্জেন্ট তাকে ভয় দেখিয়ে ছেড়ে দিল। লোকটা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পালিয়ে গেল। লোকটা জাপানি কিন্তু সত্যিই কি জেলে? মোটেই না। ঘাঁটির এলাকা পেরিয়ে এসে তার মুখে হাসি ফুটল। মনে মনে বলল, খুব ধোঁকা দিয়েছি।

লোকটা আসলে একজন তুখোড় জাপানি স্পাই নাম ইয়োসি-কাওয়া। তার ওপর ভার দেওয়া ছিল বন্দরে কটা জাহাজ আছে তা টোকিয়োকে জানিয়ে দেওয়া। এখনি জানাতে হবে কারণ নৌঘাটির ওপর এয়ার রেড হবার সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। এখন চারটে বেজে গেছে।

ইয়োসিকাওয়া দ্রুত তার আড্ডায় ফিরে গিয়ে মাছগুলো ফেলে দিয়ে একটা তোয়ালে দিয়ে গা মুছে গুপ্ত ট্রান্সমিটার খুলে বসল। পার্ল হারবরে সকলে তার নাম জানে ইতো মরিমুরা, লোকটা মাতাল, নাইট ক্লাবে ঘুরে বেড়ায়। আসলে সে যে জাপানি স্পাই, প্রতিদিন সে যে টোকিয়োতে খবর পাঠায় এ তথ্য কারও জানা নেই।

আশ্চর্যের বিষয় যে জাপানে তখন অ্যামেরিকার কোনো স্পাই

বা এজেন্ট ছিল না। বলতে কি অ্যামেরিকার তখন একটা সুসংবদ্ধ গুপ্তচর বাহিনীই ছিল না।

ইয়োসিকাওয়াকে সাহায্য করত একজন জার্মান নেভাল এঞ্জিনিয়ার। এঞ্জিনিয়ার? না, সে এঞ্জিনিয়ার নয়। নাম ছিল কুহেন। এঞ্জিনিয়ারটা খোলস, আসলে সে জার্মানির স্পাই। এ কাজে তার মেয়ে রুথ তাকে সাহায্য করত।

কুহেনের কথাবার্তা শুনে স্থানীয় ব্যক্তিরা মনে করত লোকটা বুঝি হিটলার বিরোধী কিন্তু সেটা তার অভিনয়। তার মেয়ে রুথ কিন্তু অ্যামেরিকান মহলে দারুণ পপুলার। তার একটা বিউটি পারলর ছিল।

বিউটি পারলারে অ্যামেরিকান অফিসারদের পত্নীরা আসত আর স্বামীদের বিষয়ে নানা গালগল্প করত। সেই গল্প থেকে মূল খবরটি আহরণ করে রুথ তার বাবাকে জানিয়ে দিত।

কুহেন বিলম্ব না করে সেই খবর পাঠিয়ে দিত বার্লিনে। জাপানের সঙ্গে জার্মানির বন্ধুত্ব। কিছু কিছু খবর কুহেন তার জাপানি বন্ধু ইতো মরিমুরাকেও জানিয়ে দিত।

ইয়োসিকাওয়া টোকিয়োকে জানিয়ে দিল জাহাজগুলির সংখ্যা। সকালে সাতটা পঞ্চান্ন মিনিটে অ্যাটাক আরম্ভ হয়ে গেল। পার্ল হারবরে অ্যামেরিকান নৌঘাঁটি প্যাসিফিক ফ্লিট বিধ্বস্ত হল।

মজা এই যে ঠিক সেই সময়ে ওয়াশিংটনে জাপানের অ্যামবাসাডর অ্যামেরিকার সেক্রেটারি অফ স্টেটস কর্ডেল হালের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছে যাতে জাপ-মার্কিন সম্পর্ক অটুট থাকে।

আর সেই মূহুর্তে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট টেলিফোন করলেন কর্ডেল হালকে।

জাপান পার্ল হারবর আক্রমণ করেছে, খবর শুনেছ?

না শুনি নি খবর কি পাকা? হাল জিজ্ঞাসা করল

এখনও সমর্থিত খবর পাইনি।

কার সঙ্গে কি বিষয়ে কথা হচ্ছিল জাপানি অ্যামবাসাডর বোধ

হয় বুঝতে পেরেছিল। কর্ডেল হাল যে ভাবে অ্যামবাসাডরের দিকে চাইল তাতেই জাপানী অ্যামবাসাডর কর্ডেল হালের মনোভাব বুঝতে পাবল। সে আব কথাটি না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পার্ল হাববেব ওপব এই অতর্কিত আক্রমণে অ্যামেরিকান প্যাসিফিক ফ্লিটেব দারুণ ক্ষতি হল। জাপান যে শীঘ্র যুদ্ধে নামবে এবং কোথাও না কোথাও আক্রমণ করবে এরকম অনুমান মার্কিন সরকার করছিল কিন্তু তাদেব যে এ ভাবে বোকা বানাবে তা তারা ধরতে পাবে নি।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মনে মনে খুব আঘাত পেলেন। ভাবতে লাগলেন যে তাদের সব থেকেও এমনটা কেন হল। তিনি সমস্ত ঘটনাবলী পর্যালোচনা করতে লাগলেন। জাপান থেকে পাওয়া অনেক গোপন টেলিগ্রাম এবং মিলিটাবি ইনটেলিজেন্স বা এমব্যাসি থেকে প্রাপ্ত অনেক খবরই ছিল সেগুলি সব বিশ্লেষণ কবে একটি পরিপূর্ণ তথ্য ও সংবাদ বচনা কবে প্রেসিডেন্টকে জানাবার মতো কোনো ব্যক্তি বা কমিটি বা ঐ রকম কিছুই নেই। কিন্তু জাপানের এবং জার্মানিব তাই আছে। ওদেব সুসংবদ্ধ গুপ্তচর চক্র আছে তাই ওরা আচমকা এমন আক্রমণ কবতে পাবল।

আবার যাতে এইরকম অতর্কিত কোনো ঘটনা না ঘটে সেজন্য কিছু করা দরকার। অফিস অফ কো-অরডিনেশন অফ ইনফরমেশনের কর্তা উইলিয়ম ডনোভানকে রুজভেল্ট ডেকে পাঠালেন। ডনোভান একদা অ্যাসিস্ট্যান্ট আটর্নি জেনারেল ছিলেন। তার একটা ডাকনাম আছে, 'ওয়াইল্ড বিল'।

ডনোভানকে গোপনে জরুরী খবর সংগ্রহেব জন্যে রুজভেল্ট কয়েকবার ইউরোপে পাঠিয়েছিলেন। ডনোভান নিরাশ করে নি। তখন থেকেই ডনোভানের মাথায় ঘুরছিল যে একটা কেন্দ্রীয় স্পাই এজেন্সি গঠন করা খুব দরকার।

রুজভেল্টের কাছ থেকে সব শুনে ডনোভান বলল : এ কথা তো

আমি আপনাকে অনেক আগেই বলেছি, নতুন একটা দফতর এখনি খোলা দরকার, যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে, আর দেরি করা যায় না।

ডনোভানের দফতর অফিস অফ কো-অরডিনেশন অফ ইনফরমেশনকে দু ভাগ করা হল, এক ভাগের নাম হল অফিস অফ স্ট্র্যাটেজিক সারভিস, সংক্ষেপে ও এস এস বা 'অস'। অপর ভাগের নাম হল ইউ এস অফিস অফ ওয়ার ইনফরমেশন বর্তমানে যার নাম ইউ এস ইনফরমেশন সারভিস সংক্ষেপে ইউসিস। হালে ইউসিস নামও তুলে দেওয়া হয়েছে। এখন নাম অ্যামরিকান সেণ্টার।

১৯৪২ সালের ১৩ই জুন থেকে এই দুই দফতর চালু হল।

ডনোভান বলত শুধু ট্যাংক আর বোমা দিয়েই যুদ্ধ জেতা যায় না। শত্রুর খবর সংগ্রহ করতে হবে এবং জেনারেল ফ্রাংকোর ভাষায় দেশের মধ্যে শত্রুর যে 'ফিফত কলম' গোপনে চলাফেরা করছে তাদের খুঁজে বার করতে হবে। এখন হাতে ক্ষমতা পেয়ে ডনোভান তার স্ট্র্যাটেজিক সারভিসের জন্যে নানা স্তর থেকে লোক সংগ্রহ করতে লাগল। লেখক, বুদ্ধিজীবি, ব্যবসায়ী এদেরও নিয়োগ করা হল।

আর এমন একজন লোককে ডনোভাল আনল যার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইনি হলেন জন ফস্টার ডালেসের ভাই অ্যালেন ওয়েলেশ ডালেস। পরবর্তী কালে অ্যালেন ডালেস যখন সি আই এ-এর কর্তা হয়েছিল তখন একটা কথা চালু হয়েছিল, 'সি আই এ ইজ ডালেস, ডালেস ইজ সি আই এ'।

ডনোভান যেন একটা বোহেমিয়ান ক্লাব তৈরি করল আর ক্লাবের সভ্যদের এক একটা বড় চাকরির মুখোশ পরিয়ে নিরপেক্ষ দেশগুলিতে যথা স্পেন, সুইটজারল্যাণ্ড, ট্যানজিয়ার, পর্টুগালে পাঠিয়ে দিল। তাদের চাকরি যাই হক না কেন আসল কাজ হল শত্রুপক্ষের খবর সংগ্রহ করা। আর ওদিকে ইউ এস অফিস অফ ওয়ার ইনফরমেশনের কাজ হল শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে প্রচার করা। যুদ্ধের সময় এই দুই বিভাগই তাদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা

করে নি। ও এস এস মিলিটারিকে অনেক মূল্যবান খবর সরবরাহ ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে। বিল ডনোভান ইতিমধ্যে একটা পোস্ট ওয়র প্ল্যান তৈরি করে ফেলেছে। যুদ্ধের পর যখন আবার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে তখন ওএসএস কি ভাবে কাজ করবে। তখন অবশ্য ওএসএস-কে ঢেলে সাজাতে হবে।

ডনোভান একদিন তার নতুন প্ল্যান নিয়ে রুজভেল্টের সঙ্গে দেখা করল। ডনোভানের প্ল্যান রুজভেল্ট শুনলেন; তিনি বুঝলেন যুদ্ধের সময়ও যেমন শান্তির সময়ও তেমনি সিক্রেট সারভিসের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। বর্তমান জগতে এটা দরকার। তা নইলে পার্ল হারবরের মতো একদিন আচমকা চড় খেতে হবে।

রুজভেল্ট বললেন ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন, আর্মি, নেভি এবং এয়ার ফোর্সের চিফ অফ স্টাফ ও স্টেট ডিপার্টমেন্টের বড় কর্তাদের নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা হক। সেই কমিটির সিদ্ধান্ত শুনে আমি আমার মতামত জানাব। কিন্তু ডনোভানকে আর কমিটি গঠন করতে হল না। সে সময় সে পেল না রুজভেল্ট, অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বিশ্রাম নেবার জন্যে তিনি ওয়াশিংটন ছেড়ে জর্জিয়ায় গেলেন। সেখানেই তিনি হঠাৎ মারা গেলেন।

নতুন প্রেসিডেন্ট হলেন হ্যারি এস ট্রুম্যান। এফ বি আই এবং মিলিটারির পরামর্শে তিনি ওএসএস তুলে দিলেন, শুধু তার রিসার্চ ও অ্যানালিসিস বিভাগটা স্টেট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে জুড়ে দিলেন।

কিছু দিন পরে কাজ করতে করতে নানারকম অসুবিধা দেখা দিল। ট্রুম্যান বুঝলেন যে ওএসএস হঠাৎ তুলে দেওয়া ঠিক হয় নি। কারণ তিনি দেখলেন যে বিভিন্ন দফতর থেকে অনেক খবর পাচ্ছেন, হয় তো একই খবর ভিন্ন রূপে ভিন্ন দফতর থেকে পাচ্ছেন, সামঞ্জস্য নেই। কোন খবরটার ওপর তিনি নির্ভর করবেন?

ট্রুম্যান তখন সেণ্ট্রাল ইনটেলিজেন্স গ্রুপ নামে একটা দফতর তৈরি করলেন। বিভিন্ন দফতরের খবর এই গ্রুপ সংগ্রহ করবে। সেগুলি যাচাই করবে, কোন খবর কি ভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে তার বিচার করবে এবং সব শেষে নিজেদের মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত জুড়ে দিয়ে প্রেসিডেণ্টের কাছে পেশ করবে। এতে প্রেসিডেণ্টের সময় বাঁচবে এবং নির্ভরযোগ্য খবর পেলে তিনি কাজ করতে পারবেন। এই সেণ্ট্রাল ইনটেলিজেন্স গ্রুপের জন্যে তিনজন ডিরেক্টর নিযুক্ত করা হল।

এই গ্রুপও একদিন নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল। তিনজন ডিরেক্টরের মধ্যে একজন খুব কর্মিতকর্মা ছিলেন। বলতে গেলে তিনিই গ্রুপ চালাচ্ছিলেন। তিনি একদিন চাকরি ছেড়ে দিলেন ফলে গ্রুপের কাজকর্ম প্রায় বন্ধ হয়ে গেল।

এবার ঐ সেণ্ট্রাল ইনটেলিজেন্স গ্রুপকে ভেঙ্গে নতুন করে সাজানো হল। নাম দেওয়া হল সেণ্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সি বা সংক্ষেপে সি. আই. এ।

এই এজেন্সির ডিরেক্টরের হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হল এবং ব্যয় করবার জন্যে সীমাহীন অর্থ।

সি আই এ-এর প্রথম ডিরেক্টর নিযুক্ত হলেন অ্যাডমিরাল রসকো হিলিনকোয়েটার। কিন্তু তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর সংগ্রহ করতে পারলেন না। তাকে বাদ দিয়ে এবার সত্যিই একজন অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ ব্যক্তিকে ডিরেক্টর নিযুক্ত করা হল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইনি জেনারেল আইসেনহাওয়ারের চিফ অফ স্টাফ ছিলেন। নাম ওয়ালটার বিডেল স্মিথ। বিডেল স্মিথ ডিরেক্টর ছিলেন ১৯৫৩ পর্যন্ত। তারপর ভার নেন অ্যালান ডালেস ১৯৬১ পর্যন্ত। তারপর জন ম্যাককোন।

বিডেল স্মিথ ছিলেন কর্মঠ ব্যক্তি। তিনি সি আই এ-কে রীতিমত সক্রিয় করে তুললেন। বিডেল স্মিথ হয় তো আরও কিছু কাজ

করতে পারতেন কিন্তু তাঁকে নতুন এক গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি করা হল।

নতুন ডিরেক্টর নিযুক্ত হল অ্যালান ডালেস। সি আই এ-এর মধ্যে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করল ডালেস। আগেই বলা হয়েছে একটা কিংবদন্তীই আছে ডালেস ইজ সি আই এ, সি আই এ ইজ ডালেস। ডালেসকে কেউ কেউ বলত মিঃ সি আই এ।

এই হল অতি সংক্ষেপে সি আই এ-এর জন্মবৃত্তান্ত।

সি আই এ এর কিছু পরিচয় জানলে রাশিয়ার কে জিবি-এর ও কিছু পরিচয় জানা দরকার।

সোভিয়েট রাশিয়াতে দুটো গুপ্তচর সংস্থা আছে, একটা হল অসামরিক বিভাগ। সেটার নাম হল কে জি বি (কমিটি অফ স্টেট সিকিউরিটি) আর অপরটা হল সামরিক ব্যাপার, নাম জি আর ইউ, (মিলিটারি ইনটেলিজেন্স এজেন্সি উচ্চারণ হল 'গেরু')।

রাশিয়ার গুপ্তচর বিভাগ পুরনো, জারের আমল থেকে চলে আসছে। তখন সেই গুপ্তচর দফতরের নাম ছিল 'ওখরানা' (ডিপার্টমেন্ট অফ ষ্টেট প্রোটেকশন)। এ হল জারের আমল। জার সুদূর আমেরিকাতেও গুপ্তচর পাঠাতেন।

যারা জারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল সেই সব বিপ্লবাদীদের বিষয় সকল তথ্য ওখরানা সংগ্রহ করেছিল। ওখরানা দফতরে স্টালিনেরও ফাইল ছিল। ওখরানা পুলিস বিভাগের ওপরও তদারকি করত।

ইতিমধ্যে রাশিয়াতে অনেক কাণ্ড ঘটে গেল। রাশিয়ার পরাক্রান্ত জার গদিচ্যুত হয়েছে। বলশেভিকরা ক্ষমতা দখল করেছে। তারপর বলশেভিকদের মধ্যে মেনশেভিক নামে যে দল ছিল তারাও পৃথক হয়ে গেছে। এখন শুধু বলশেভিক তথা লেনিনই সর্বাধিনায়ক।

লেনিন সিক্রেট সারভিসের প্রয়োজনীয়তা বুঝতেন। সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবর পার্টির অন্যতম কর্মী ফেলিক্স জেরসিনস্কির ওপর

তিনি ভার দিলেন ওখরানাকে নতুন করে গড়ে তুলতে। জেরসিনস্কি দ্রুত কাজ করল। সে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই মেনসেভিকদের কোনঠাসা করে দিল। ওখরানাকে ভেঙ্গে চুরে নতুন সিক্রেট সার্ভিস গড়ে তুলল। তার নতুন নাম হল চেকা! দুটি রাশিয়ান শব্দের প্রথম দুটি অক্ষর নিয়ে এই নামকরণ হল। চেকা এতদূর শক্তিশালী হয়ে উঠল যে সকলেই তার ভয়ে কাঁপত।

চেকা নামটাও বেশি দিন চলল না। দু বছর পরে দফতরের নতুন নাম হল জি পি ইউ। এক বছর পরে অক্ষর তিনটির আগে একটি ও জুড়ে দেওয়া হল। এবার নাম হল ও জি পি ইউ অর্থাৎ 'ওগপু'!

তারপর কয়েক বছর পরে জেরসিনস্কি মারা গেল। নতুন কর্তার নাম মেনজেনস্কি তবে ওগপুর আসল কাজকর্ম দেখত তার সহকারী জেনরিক ইয়াগোডা।

ইয়াগোডাকে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয় নি। মেনজেনস্কি মারা যাবার পর সে হল ডিরেক্টর। অনেকে সন্দেহ করে যে ডিরেক্টর হবার জন্যে ইয়াগোডা নাকি মেনজেনস্কিকে বিষ খাইয়ে হত্যা করেছিল।

ইয়াগোডা ডিরেক্টর হবার পর ওগপু-এর আবার নাম বদলে গেল। নতুন নাম হল এন কে ভি ডি তবে ভেতরে ভেতরে ওগপু-এর মূল দফতরটি রয়ে গেল। সেই দফতরের কাজকর্ম দেখবার জন্যে আর একটি মূল দফতর খোলা হল যার সংক্ষিপ্ত নাম জিউজিবি।

ততদিন স্টালিনের আমল এসে গেছে। স্টালিন কিন্তু ইয়াগোডাকে বিদায় করলেন। তার কাজে স্টালিন সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। বোধ হয় মৃত্যুদণ্ডই দেওয়া হয়েছিল।

এন কে ভি ডি এর নতুন ডিরেক্টর হল স্টালিনের বিশ্বস্ত নিকোলাই ইয়েজফ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার বছরখানেক আগে ইয়েজফকে দফতর থেকে সরিয়ে অন্য কাজের ভার দেওয়া হল। নতুন ডিরেক্টর হল মহা পরাক্রান্তশালী লাভরেন্তি বেরিয়া। বেরিয়া ছিল স্টালিনের

ডান হাত। স্টালিনের মতো বেরিয়াও ছিল জর্জিয়ার লোক। স্টালিন তাকে এতদূর বিশ্বাস করতেন যে ১৯৫৬ সালে বেরিয়াকে তিনি পলিটব্যুরোর মেম্বার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু স্টালিনের মৃত্যুর পর সেই মহাপরাক্রান্ত বেরিয়াবও পতন হতে দেরি হয়নি।

এন কে ভি ডি-এর ভেতবে একটি বিভাগ খোলা হল, নাম হল এন কে জি বি। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। যুদ্ধের প্রয়োজনেই এই নতুন বিভাগ। পরে অবিশ্যি এন কে জি বি উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার পরিবর্তে এল, এম জি বি আর ওদিকে এন কে ভি ডি-এব নতুন নাম হয়েছে, তাকে আরও বড় ও শক্তিশালী করা হয়েছে। নতুন নাম এম ভি ডি।

স্টালিনের মৃত্যুর পর এম জি বি এসে গেল এম ভি ডি-এর অধীন। বেরিয়াই হলেন সবময় কর্তা। তাকে মন্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া হল।

তারপর স্টালিনের মৃত্যু হল এবং ক্রমে ক্রুশ্চভ ক্ষমতায় এল। বেরিয়া তার ক্ষমতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। সে খুব দাপটের সঙ্গে আদেশ জারি করত কিন্তু ভুলে গিয়েছিল যে তার রক্ষাকর্তা স্টালিন আর নেই। বেরিয়া এতদূর বেড়ে গিয়েছিল যে প্রেসিডিয়মের কর্তাদেরও সে হুমকি দিয়ে কথা বলত।

বেরিয়াকে ক্রুশ্চভ সহ্য করতে পারত না। বেরিয়াব বাড়াবাড়ি দেখে এবং তাকে শায়েস্তা করবার জন্যে ক্রুশ্চভ প্রেসিডিয়মের মিটিং ডাকল। মিটিং-এ বুলগানিন, মলোটভ, মালেনকভ, জুখভ্ ম্যালিনভস্কি ইত্যাদি বাঘা বাঘা ব্যক্তিরা হাজির ছিল।

বৈঠক চলবার সময় চারদিকে সশস্ত্র পাহারা ছিল। তারা অবিশ্যি বেরিয়ারই লোক। বৈঠকে বেরিয়া চেঁচামেচি শুরু করল। তার হাতে সিক্রেট পুলিস, সে নাকি নেতাদের অনেক গোপন খবর জানে, সে সব ফাঁস করে দেবে।

বেরিয়া খুব ধূর্ত। একটু পরে ক্রুশ্চভের অভিযোগ শুনে বুঝল যে তাকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে ওই মিটিং ডাকা হয়েছে, তখন সে মরণ

কামড়ের জন্যে তৈরি হয়ে নিজের অ্যাটাচি কেস খোলবার চেষ্টা করল যার মধ্যে ছিল একটি অটোম্যাটিক গান।

স্যুটকেসে হাত দিতেই ম্যালেনকভ কল বেলের বোতাম টিপেছে এবং বেরিয়া বন্দুক বার করবার আগেই মোসাকালোক ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে বেরিয়াকে গুলি করে অনেকে বলে ক্রুশ্চভ নিজেই নাকি বেরিয়াকে গুলি করেছিল। কোনো ঘটনারই সত্য মিথ্যা যাচাই করা যায়নি।

বেরিয়ার পর এম ভি ডি এর কর্তা হল ক্রুগলভ।

টেহেরান কনফারেন্সের সময় চার্চিল ও রুজভেল্টকে হত্যা করার জন্যে জার্মানরা ষড়যন্ত্র করেছিল। ক্রুগলভ সেই ষড়যন্ত্র টের পেয়ে ওই দুই নেতার প্রাণ বাঁচিয়েছিল। বলা বাহুল্য যে বেরিয়ার কর্ম পদ্ধতি ক্রুশ্চভ সমর্থন করত না, অতএব এম ভি ডি-কে ভেঙেচুরে নতুন করে তৈরি করা হল এবং নতুন নাম দেওয়া হল কে জি বি। কমিটি ফর স্টেট সিকিউরিটি কে জি বি-এর ক্ষমতা ও কার্যকলাপ অত্যন্ত ব্যাপক, সারা পৃথিবী জুড়ে। কে জি বি ব্যতীত অন্য দেশের সামরিক শক্তির ওপর নজর রাখবার জন্য রাশিয়ার আর একটি গুরুত্ব-পূর্ণ দফতর আছে যার নাম জি আর ইউ (উচ্চারণ নাকি গেরু) এই দুইয়ের কাজকর্মে একটা স্পষ্ট সীমা রেখা টানা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে এই দুই দফতর পরস্পরের হয়ে কাজ করছে।

কে জি বি একটি বিরাট দফতর। এর নানা বিভাগ, উপবিভাগ, শাখা' প্রশাখা আছে। সেই সব বিবরণী জানতে হলে একখানা পৃথক বই দরকার হবে। আপাততঃ আমি আপনাদের কয়েকটি চাঞ্চল্যকর 'স্পাই কাহিনী শোনাই।

সোভিয়েট নিউজ এজেন্সি টাস-এর প্রথম-বুলেটিনটি ছিল সংক্ষিপ্ত। সংক্ষেপে সংবাদটুকু ছাড়া বিবরণী দেওয়া হয়নি। তবুও সেই সংক্ষিপ্ত খবর পড়ে সারা রাশিয়া কেঁপে উঠল আর বাকি পৃথিবী অবাক।

মাত্র তিন লাইনের খবর।

আটজন উচ্চপদস্থ সোভিয়েট মিলিটারী কমাণ্ডার দেশদ্রোহিতার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। তাদের গুলি করে মারা হয়েছে। ফায়ারিং স্কোয়াড তাদের কর্তব্য পালন করেছে।

এই হল আরম্ভ। এই ঘটনার পর কয়েক মাসের মধ্যে দশজন নয়, বিশজন নয়, একশো নয়, দুশো নয়, পঁয়ত্রিশ হাজার অফিসার, রেড আর্মির অর্ধেক অফিসারকে হয় গুলি করে হত্যা করা হল, নয় তো সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হল সামরিক বিভাগে এমন সাংঘাতিক ওলটপালট, হত্যাকাণ্ড বা পার্জ আর কোনো দেশে কখনও সংঘটিত হয় নি।

সেই সময়ে মসকোতে যে সকল মার্কিন 'সাংবাদিক ছিল, তারা নিহত সেনানায়কদেব গুপ্তচর বলে অভিহিত করে ছিল—বলেছিল যারা মরেছে তাবা সকলেই ছিল সোভিয়েট বিরোধী এবং স্পাই।

আসল ঘটনা যে কি তা তারা টের পায়নি। এর পশ্চাতে অন্য এক দেশের যে বিরাট ষড়যন্ত্র আছে তা তারা অনুমান করতেই পারে নি।

সোভিয়েট খবরের কাগজেও স্পষ্ট করে কিছু বলা হয় নি। যা কিছু বলা হত সবই ভাসা ভাসা অস্পষ্ট। যেমন, 'ওরা শত্রু মনোভাবাপন্ন কোনো দেশের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছিল' কিংবা 'মাতৃভূমির প্রতি তারা বিশ্বাসঘাতকতা ও সাবোটাজ করেছে'। যারা নিজেদের ক্রেমলিন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলে মনে করে তারাও কিছু অনুমান করতে পারল না। কেন নির্বিচারে ও ব্যাপকহারে এই হত্যা? কি এর কারণ? কেউ কিছু বলতে পারল না।

এই বিরাট হত্যাকাণ্ডের পশ্চাতে কে ছিল। স্ট্যালিন? বেরিয়া? মালেনকভ? ক্রুশ্চভ?

না, না, এরা কেউ নয়। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ছিল একজন নাৎসী জার্মান। সোভিয়েট রাশিয়াতে হত্যাকাণ্ড চলছে আর সেই লোকটি জার্মানিতে বসে বসে হাসছে। সব জেনে শুনেও সে কোনো

প্রেস কনফারেন্স ডেকে ঘোষনা করতে পারে নি যে, ওগো শোনো সোভিয়েট রাশিয়ায় যা ঘটছে তার কলকাঠি বার্লিনে বসে আমি নাড়ছি।

সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রবেশ না করেও, একটিও বোমা না ফেলে বা একটিও গুলি না ছুঁড়ে বার্লিনে বসে সেই সাংঘাতিক লোকটি এমন ভীষণ এক ষড়যন্ত্র করল যে হাজার হাজার নির্দোষ রাশিয়ান সেনানায়ককে প্রাণ দিতে হল। সেই সাংঘাতিক জার্মান নাৎসী তথা হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েট সামরিক যন্ত্রকে শুধু পঙ্গু বা বিকল নয়, সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া।

তাই হিটলারের নির্দেশে সেই ব্যক্তিটি স্ট্যালিনকে বিরাট এক ধাপ্পা দিয়েছিল যার তুলনা ইতিহাসে মেলে না। এই জন্যে সেই জার্মান···কি করেছিল তাহলে শুনুন।

অ্যাডলফ হিটলারের সিক্রেট স্টেট পুলিশ গেস্টাপোর নাম সবাই জানে। নাম শুনে এখানে বসে আমরাও ভয়ে কাঁপতুম। থার্ড রাইখের আরও একটি দফতর ছিল, তার নাম ছিল সিকিউরিটি সারভিস, সংক্ষেপে বলা হত 'এস ·ডি'। সারা পৃথিবী জুড়ে ছিল এদের কর্ম তৎপরতা, উদ্দেশ্য ছিল যত রকম সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করা। এই সিকিউরিটি সার্ভিসের প্রধান ছিল রাইনার্ড হেড্‌রিশ।

এই রাইনার্ড হেড্‌রিশই হল নাটের গুরু, এরই জন্যে সোভিয়েট রাশিয়া যুদ্ধে হারতে বসেছিল। এর নাম আপনারা শুনেছেন। এই লোকটিই একদিন ইউরোপে 'হেডরিশ দি হ্যাংম্যান' নামে পরিচিত হয়ে ক্যানস্যারের মতো খ্যাতি অর্জন করেছিল। তবে হেডরিশ নিজেও মুক্তি পায়নি। চেকোশ্লোভাকিয়ার দেশপ্রেমিকরা তাকে লিডিস শহরে হত্যা করেছিল। জার্মানরাও ছাড়েনি, তারা প্রতিশোধ নিয়েছিল। লিডিস শহরটি নিশ্চিহ্ন করে ছেড়েছিল। নরনারী শিশু কাউকে জীবিত রাখেনি। ১৯৩৭ সালে সোভিয়েট রাশিয়ায় এই পার্জের সময় জার্মানির বাইরে তার নাম কেউ জানত না।

লোকটা ছিল সাক্ষাৎ শয়তান। হাতের আঙুলগুলো ছিল সরু কাঠির মতো। লোকটা নাকি ভাল বেহালা বাজাতে পারত, আবার ঐ আঙুলেই কলম ধরে কোনো ব্যক্তিবিশেষের শাস্তি বা মৃত্যুদণ্ডে স্বাক্ষর করত। লোকটার প্রখর বুদ্ধি ছিল ঠিকই, কিন্তু কোনো ভাল কাজ করবার জন্যে সে বুদ্ধি খরচ করে নি।

হেডরিশের ওপরওয়ালা ছিল হিমলার, সাক্ষাৎ বিভীষিকা। সে হেডরিশকে বলত 'দি ম্যান উইথ দি আয়রন হার্ট'।

হিটলার ক্ষমতায় আসার আগেই হেডরিশ নাৎসী পার্টিতে যোগ দিয়েছিল তবে লোকটি তার কর্তব্যে কঠোর হলেও নারীর প্রতি তার বিশেষ দুর্বলতা ছিল। সেই যৌবনে সে নারীঘটিত ব্যাপারে বেশ কয়েকবার জড়িয়ে পড়েছিল।

গোড়ার দিকে সে যখন জার্মান নেভিতে লেফটেনাণ্ট ছিল, সেই সময়ে একজন খ্যাতনামা নেভাল আর্কিটেক্টের কন্যার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়। মেয়েটি অন্তঃস্বত্বা হয়ে পড়ে। সেই মেয়েটি ও তার পরিবারের সকলেই ভাবে যে হেডরিশ তাকে বিয়ে করে তার ও তার পরিবারের সম্মান রক্ষা করবে। হেডরিশ সে পাত্রই নয়। সে কিছুতেই রাজি হল না। ব্যাপারটা নেভাল কোর্ট অফ অনার পর্যন্ত পৌঁছয়।

হেডরিশের নামে সমন জারি হয়। কোর্টে হাজির হতে তাকে আদেশ দেওয়া হয় কিন্তু বাবুর সে কি রাগ, কি মেজাজ! বলে, ওই বাজে মেয়েটাকে বিয়ে করার কোন প্রশ্নই ওঠে না, ও অনেককে ফাঁসিয়েছে। অবিবাহিত পুরুষদের যে মেয়ে আত্মদান করতে পারে সে একজন বিশিষ্ট নেভাল অফিসারের বৌ হতে চায় কোন সাহসে? আর ওই মেয়ে বা তার বাপ মা কোন সাহসে বিয়ের প্রস্তাব করে?

তার মতে মত দিতে পারল না কোর্ট অফ অনার। তার যুক্তি মেনে নিতে পারল না, কিন্তু জোর করে বিয়ে দেওয়াতেও পারল না। তবে হেডরিশকে নেভি থেকে কোর্ট বিতাড়িত করল, এমন দুশ্চরিত্র লোকের স্থান নেভিতে হতে পারে না। নেভি থেকে বিতাড়িত হয়ে

হেডরিশ হিটলারের এস এস কোরে ঢুকে পড়ল। সেখানে তখন নীতিহীন ব্যক্তিদের প্রয়োজন ছিল।

ছোকরা কাজের দিকে ঠিক ছিল, নিজের কাজ গুছোতে ওস্তাদ ছিল। এস এস কোরে তার দুর্দান্ত প্রতাপ, অসীম ক্ষমতা, নেভির অ্যাডমিরালের চেয়ে এখানে তার ক্ষমতা অনেক বেশি।

এস এস কোবের সিকিউরিটি বা ইনটেলিজেন্স শাখার সে হল প্রধান। নাৎসী দলের ছোটবড় কর্তাদের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে সে সপ্রমাণ তথ্য সংগ্রহ করতে লাগল। তার সেই গোপনীয় তালিকা থেকে স্বয়ং হিটলার এবং হিমলারও বাদ পড়ল না। তাদেরও ব্যক্তিগত জীবনীপঞ্জী গোপনে সংগ্রহ করে রাখল। এইসব গোপনীয় ফাইল হেডরিশ সযত্নে রক্ষা কবত। ইচ্ছে করলে সে যাকে খুশি ব্ল্যাকমেল কবতে পাববে। ইজন্যে হেডরিশকে অনেকেই ভয় করতে আরম্ভ করল।

খাস জার্মানিব তথ্য সংগ্রহ সম্পূর্ণ হলে হেডরিশ বিদেশের দিকে নজর দিল। ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, চেকোস্লোভাকিয়া, সোভিয়েট রাশিয়া, রোমানিয়া, ইটালি প্রভৃতি দেশের তথ্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করল। গোপনীয় ফাইলের সংখ্যা একে একে বাড়তে লাগল।

হেডরিশ খুব ধূর্ত। বার্লিনের অভিজাত পাড়ায় যেখানে অভিজাত ব্যক্তিরা যাতায়াত করে, এইরকম এক পাড়ায় সে সরকারী সহায়তায় 'কিটি স্যালন' নামে একটি বার ও রেস্তরাঁ খুলল। ভাল ভাল মদ পাওয়া যেত এই বার-এ-আর সারা ইউরোপের সেরা খাবার এই রেস্তরাঁতে পাওয়া যেত।

শুধু মদ আর আহার নয়। ওপরে ভাড়া পাওয়া যেত সুসজ্জিত, আরামপ্রদ ও বিলাসবহুল প্রাইভেট রুম, দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যা ও শয্যাসঙ্গিনী। এই সঙ্গিনীরা সাধারণ গণিকা নয়, বাছাই করা সুন্দরীর দল। তাদের কিছু শিক্ষাদীক্ষা আছে। প্রয়োজনমত তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়া হত। সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে এই সব

যুবতীদের সংগ্রহ করা হয়েছিল। জার্মান ছাড়া অন্য দেশের মেয়েও ছিল।

বার্লিনে সব দেশেরই এমব্যাসি ছিল। অ্যামবাসাডর থেকে আরম্ভ করে এমব্যাসিগুলির বিভিন্ন স্তরের সেক্রেটারি, অ্যাটাসে ও অন্যান্য অফিসাররাও 'কিটি স্যালনে' ভিড় জমাতে আরম্ভ করল। 'কিটি স্যালন' অচিরে বৈদেশিক কূটনীতিকদের একটি ক্লাব হয়ে দাঁড়াল। সুন্দরী যুবতী, উৎকৃষ্ট আহার ও পানীয়, লোভনীয় নৃত্য গীত ও সঙ্গীতের প্রবল আকর্ষণে সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তিরা 'কিটি স্যালনে' ভিড় জমাতে লাগল।

আর ঘরে ঘরে বসানো হল গুপ্ত মাইক্রোফোন। নেশায় বিভোর হয়ে যুবতীর কোমল আলিঙ্গনে কোনো কূটনীতিক অনেক কিছু বলে ফেলত। সেগুলি যথাস্থানে পৌঁছে যেত গোপন মাইক্রোফোনের মাধ্যমে। যুবতীরাও সচেষ্ট ছিল কূটনীতিকদের পেটের কথা বার করতে। কি করে কথা বার করতে হবে সেজন্যে তাদের ট্রেনিং দেওয়া হত। তাদের সাহায্য করবার জন্যে ওয়েটারের আবরণে থাকত দক্ষ গুপ্তচরের দল।

১৯৩৬ সালের ডিসেম্বরে বাইরে যখন তুষারপাত হচ্ছে, সেই সময়ে 'কিটি স্যালনে' এক দীর্ঘকায় সুপুরুষ প্রবেশ করলেন। চলনে-বলনে কেতাদুরস্ত, স্মার্ট, ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় একদা মিলিটারিতে কোনো উচ্চপদস্থ অফিসার ছিলেন, হয়তো জেনারেলই ছিলেন। তাঁর মেজাজ ও কণ্ঠস্বর সেইরকম তবে অভদ্র নয়।

লোকটির নিশ্চয় একটা নাম আছে। সে নাম হল নিকোলাই স্কোবলিন। তিনি রাশিয়ার জারের অফিসার ছিলেন। বলশেভিক বিদ্রোহ দমন করবার জন্যে হোয়াইট আর্মির একজন কমাণ্ডারও ছিলেন।

প্যারিসে একদল হোয়াইট রাশিয়ান আছে। তাদের উদ্দেশ্য সোভিয়েট শাসনতন্ত্রকে উৎখাত করা। নিকোলাই স্কোবলিন হলেন

এই দলের সক্রিয় নেতা। তারা জানে না তাদের স্বপ্ন কোনদিন সার্থক হবে কিনা তবুও তারা কাজ করে চলেছে এবং এইজন্যেই স্কোবলিন মাঝে মাঝে প্যারিস থেকে বার্লিনে আসে। সময় কাটাবার জন্যে বা কোনো কূটনীতিদের সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি 'কিটি স্যালনে' ঢুকতেন।

নিকোলাই স্কোবলিন রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক সরকারকে শত্রু মনে করতেন। এই সরকারের পতন ঘটাবার জন্যে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। স্বভাবতই তিনি গেস্টাপোব এস ডি-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং এই জন্যেই তিনি বার্লিনে আসতেন।

মসকোতেও তাঁর এজেন্ট ছিল। তারা লুকিয়ে ক্রেমলিনের অনেক গোপন খবর তাঁকে জানাত।

বর্তমানে তিনি খবর পেয়েছেন যে সোভিয়েট রাশিয়ায় স্ট্যালিন যে কলেকটিভ ফার্ম অর্থাৎ কৃষিক্ষেত্রগুলিকে যৌথ খামার করবার চেষ্টা করছেন, কৃষকেরা তার বিরোধিতা করছে। কলেকটিভ ফার্মিং করতে কৃষকেরা যাতে বাধ্য হয় সেজন্যে তিনি তার সেনানায়কদের কড়া আদেশ দিয়েছিলেন। দরকার হলে নির্বিচারে ও বেপরোয়াভাবে গুলি চালাতে হবে।

কিন্তু সেনানায়কেরা নাকি এভাবে গুলি চালিয়ে মানুষ হত্যা করতে রাজি নয়। এই নিয়ে সেনানায়কদের সঙ্গে স্ট্যালিনের দারুণ মানোমালিন্য চলছে। এই খবর নিকোলাই স্কোবলিনের হাতে এসে পৌঁছেচে।

রুশ সেনানায়কদের অভিমত: সোভিয়েট সৈনিকদের মেরুদণ্ড হল তার কৃষকশ্রেণী। সেই কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে। অতএব রেড আর্মিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে স্ট্যালিনকেই বাদ দিতে হবে, কৃষকদের নয়। এই নাকি সোভিয়েট সেনানায়কদের সুচিন্তিত অভিমত।

স্কোবলিনের হাতে আরও খবর এসেছে নাকি যে সোভিয়েট

সেনানায়কেরা ইতিমধ্যে জার্মান সেনানায়কদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তারা নাকি জার্মানদের অনুরোধ করেছে, তাদের এই অন্তর্কলহের সুযোগ নিয়ে জার্মানি যেন সোভিয়েট রাশিয়াকে আক্রমণ না করে। জার্মানরা রাজি হলে সোভিয়েট সেনানায়কেরা স্ট্যালিনকে উৎখাত করার পরে উক্রেনের কিছু অংশ জার্মানিকে দান করবে। এই খবর শুনে হেডরিশ লাফিয়ে উঠল। দারুণ খবর। হিটলারের অনেক দিনের সাধ সোভিয়েট রাশিয়াকে করতলগত করা। সুযোগ এসে বুঝি দরজায় কড়া নাড়ছে।

হেডরিশের বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ। সে দ্রুত চিন্তা করতে পারে। ভবিষ্যত চট করে ভেবে নিতে পারে। এই সুযোগে পুরো সোভিয়েট রাশিয়া যদি করতলগত করা যায় তবে উক্রেনের এক টুকরো জমি নিয়ে কি হবে?

সোভিয়েট জেনারেলরা স্ট্যালিনকে সরাবে? তার আগেই যদি স্ট্যালিন সোভিয়েট জেনারেলদের সরাতে পারে তাহলে তো রেড-আর্মি দুর্বল হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এই রকম একটা প্ল্যান করতে হবে যাতে স্ট্যালিনই তার জেনারেলদের খতম করতে পারে।

রাইনার্ড হেডরিশ যে রিপোর্ট পেয়েছিল তাতে একটি উল্লেখযোগ্য নাম ছিল। মিখাইল তুখাশেভস্কি, স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে যারা চক্রান্ত করছে তাদের নেতা।

এই নামটির প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল তুখাশেভস্কি হল সোভিয়েট আর্মির চিফ অফ স্টাফ। সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যতম মার্শাল, সামরিক বিভাগের ডেপুটি কমিশনার।

এ ছাড়া তুখাশেভস্কি একজন প্রতিভাশালী সমরনায়ক। রুশ গৃহযুদ্ধের সময় সে যখন বলশেভিক সেনাদের জেনারেলরূপে সৈন্য পরিচালনা করত তখন তার বয়স ছিল মাত্র পঁচিশ। তুখাশেভস্কি ছাড়া বলশেভিক বিপ্লব সাফল্য লাভ করত কিনা সন্দেহ। হোয়াইট আর্মি যখন জয়ের মুখে তখন তাদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেছিল এই তুখাশেভস্কি।

ট্রটস্কি নির্বাসিত হবার পর রেড আর্মিকে নিপুনভাবে গঠন করে এই তুখাশেভস্কি। তার সামরিক প্রতিভা ছিল অসাধারণ, তাকে বলা হত রেড নেপোলিয়ন।

এ হেন মিলিটারি জিনিয়স তুখাশেভস্কিকে যদি চূর্ণ করা যায় তাহলে তো জার্মান আর্মির পথ পরিষ্কার। ভাবতে থাকে হেডরিশ। হেডরিশ জানে যে স্ট্যালিন বাঘের মতো সন্দেহ প্রবণ। একদা যারা স্ট্যালিনের সহযোগী ছিল তাদের অনেককেই পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিতে হয়েছে। হয়তো তার প্রয়োজন ছিল নতুবা হয়তো নবীন রাষ্ট্রকে বাঁচানো যেত না। এখন এমন একটা চক্রান্ত করতে হবে যাতে স্ট্যালিন তুখাশেভস্কিকে সন্দেহ করে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে সরিয়ে ফেলে।

মদের অনেক বোতল খালি করে, অনেক সিগারেট পুড়িয়ে, অনেক মাথা ঘামিয়ে হেডরিশ একটা চক্রান্ত খাড়া করল। দারুণ একটা পাকা প্ল্যান যাকে বলে মোক্ষম। তারপর সেই প্ল্যান নিয়ে ১৯৩৬ সালের বড়দিনের সময় স্বয়ং হিটলারের সঙ্গে ব্যাভেরিয়ান আলপসে তার শৈলাবাসে বসে আলোচনা করল। অনেক আলোচনা করে কিছু কিছু অদলবদল করে প্ল্যানটা চূড়ান্ত করা হল। হিটলার সম্মতি দিলেন।

হিটলারের শৈলাবাস থেকে বার্লিনে ফিরে এসেই হেডরিশ কাজ আরম্ভ করে দিল এবং এই সঙ্গে আরম্ভ হল নতুন ইতিহাসের নতুন এক পরিচ্ছেদ। সুষ্ঠুভাবে কাজ চালাবার জন্যে এস ডি বিভাগকে কিছু কিছু দলিল পত্র জাল করতে হত। কাজটা অনেক সময়ে নিখুঁত হত না অথচ হেডরিশ এখন যে কাজ করতে যাচ্ছে তাতে এমন নিখুঁত জাল করতে হবে যাতে মূল দলিল আসল মনে করা যেতে পারে। সে জন্যে চাই উপযুক্ত সাজ সরঞ্জাম, উপযুক্ত লোক, নিপুণ শিল্পী, দক্ষ জালিয়াত।

অতএব স্টালিনকে ধাপ্পা দেবার জন্যে, প্ল্যান সফল করবার জন্যে বার্লিনের উপকণ্ঠে মস্ত বড় একখানা বাড়ি নেওয়া হল। বাড়িখানার

মালিক ছিল একজন ইহুদি। তাকে তো আগেই উৎখাত করা হয়েছিল, এখন সেই বাড়িতে আনা হল নানারকম সাজসরঞ্জাম। বসানো হল মুদ্রণের ও ব্লক কববার যন্ত্রপাতি, কতরকম ক্যামেরা এবং আরও কত কি। একটা এক্স-রে প্ল্যান্টও ছিল। বলতে গেলে বাড়িটাতে একটা ল্যাবরেটরি বসানো হল। সমস্ত ব্যাপারটাই খুব গোপন রাখা হল। ভেতরে কি হচ্ছে কেউ জানে না।

আসল প্ল্যানের বিষয় স্বয়ং হিটলার ও হেডরিশ ছাড়া আর মাত্র দু'জন জানত। সেই বাকি দু'এক জনেরও প্রাণের ভয় ছিল। কণামাত্র যদি ফাঁস হয় তাহলেই তাদের মরতে হবে। তারা মুখ বন্ধ করেই রেখেছিল। হিটলারেরও আদেশ ছিল যে কাজটা যেন হেডরিশ এবং তার এস ডি বিভাগেব মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, পাঁচ কান হলেই ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাবে এবং তা অচিরেই স্ট্যালিনের কানে উঠবে। স্ট্যালিনেরও অনেক কান আছে।

সোভিয়েট জেনারেল এবং জার্মান জেনারেলদের মধ্যে চিঠি চালাচালি হচ্ছে, উদ্দেশ্য স্ট্যালিনকে উৎখাত কবা। উভয় পক্ষের এই রকম কিছু চিঠি নিখুঁতভাবে জাল করতে হবে। সেই সব চিঠি যাতে স্ট্যালিনের হাতে পড়ে তার ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলেই স্ট্যালিন ক্ষেপে উঠবে এবং আগুনও জ্বলে উঠবে। তবে চিঠি জাল যেন একেবারে নিখুঁত হয়। কণামাত্র ত্রুটি থাকলেই বিপদ।

এইসব চিঠি জাল করতে হলে উভয় দেশের উভয় পক্ষের এই রকম কিছু মুল চিঠি সংগ্রহ করতে হবে এবং গোপনে। কারণ চিঠি সংগ্রহ করতে যেয়ে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যেতে পারে। অতএব খুব গোপনে ও খুব সাবধানে কিছু চিঠি স্রেফ চুরি করতে হবে! সেই সব চিঠি কোন ঘরে কার জিম্মায়, এবং কোন ফাইলে ও কোন আলমারিতে আছে হেডরিশ তা জানে। এখন সমস্যা হচ্ছে কি করে কাজ হাসিল করা যায়!

প্রথম মহাযুদ্ধের পর অ্যামেরিকা এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশ

যথা ইংলণ্ড বা ফ্রান্স ; জার্মানি এবং রাশিয়াকে অপাংক্তেয় মনে করত। এই দুই দেশকে ওরা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করত। কারণ এরা অন্য দেশকে পদানত করবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করে হেরে গিয়েছিল।

রাশিয়া চাইছে পুঁজিবাদ ধ্বংস করতে, সব মানুষকে সমান মর্যাদা দিতে, নতুন এক সমাজ গঠন করতে। ব্যাপারটা অ্যামেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্সের মনঃপুত নয়। তাই অপাংক্তেয় জার্মানি ও রাশিয়া পরস্পরের উপব নির্ভর করত। তখন তাদের কেউ বন্ধু ছিল না।

১৯২০ সালে দুই দেশে সামরিক ব্যাপারে একটা চুক্তি হয়। জার্মানি যুদ্ধে হেবে গিয়েছিল। ভার্সাই চুক্তি তার ওপর কঠোর শর্ত চাপিয়ে দিয়েছিল। মিত্র শক্তির মতলব ছিল জার্মানিকে পঙ্গু করে দেওয়া, সে যেন আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পাবে। তার সৈন্য সংখ্যাব সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। অস্ত্রসস্ত্র ও ইচ্ছামতো যাতে বাড়াতে না পাবে সেদিকেও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। এমন কি জার্মান শিশুরা যাতে দুধ খেতে না পায় সেদিকেও নজর বাখা হত।

জার্মানি রাশিয়ার সঙ্গে একটা গোপন চুক্তি করল। তার ফলে জার্মান সৈন্যরা রাশিয়ায় গিয়ে সমর কৌশলের ট্রেনিং নিত, নতুন অস্ত্র পরীক্ষাও করত।

পবিবর্তে সোভিয়েট সেনাপতিরা জার্মানিতে এসে জার্মানির অভিজ্ঞ ও সমরকুশলী সেনানায়কদের কাছ থেকে সমরকৌশল আয়ত্ব করত। দুই দেশের সামবিক বিভাগের মধ্যে একটা বোঝাপড়া ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। হিটলার ক্ষমতায় আসবার আগে পর্যন্ত এই যোগাযোগ অব্যাহত ছিল।

বলা বাহুল্য এই আঁতাতের সময় দুই দেশের সামরিক বিভাগ ও সমরনায়কদের মধ্যে চিঠিপত্র চলত। তারা নিজ নিজ লেটার হেড কাগজ ও খাম ব্যবহার করত। চিঠির নীচে সমর নায়কদের স্বাক্ষরও থাকত।

হেডরিশের দরকার এই রকম নাম ছাপা কিছু লেটারহেড এবং স্বাক্ষর। চিঠিগুলি কোথায় কার ঘরে কার সিন্দুকে কোন ফাইলে আছে সে খবর তো ধূর্ত হেডরিশ আগেই সংগ্রহ করেছিল। ওয়ার মিনিস্ট্রির আরকাইভস সেকশনে খোঁজ করলেই অনেক চিঠি পাওয়া যাবে। হেডরিশ কয়েকজন দক্ষ ও বলবান চোর সংগ্রহ করল। তাদের উত্তমভাবে তামিল দিয়ে আরকাইভস সেকশন থেকে চিঠিগুলি চুরি করিয়ে আনল।

চোরেদের বলা হয়েছিল, ধরা পড়লে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করা হবে।

কিন্তু খবরদার যারা চুরি করতে বলেছে তারা যদি তাদের নাম বলে তাহলে কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যেই তাদের মৃত্যু হবে।

বিনা বিঘ্নে অনেক চিঠি চুরি হল। স্ট্যালিনকে ধাপ্পা দেবার জন্যে অর্ধেক কাজ ফতে হল। আসল কাজ অনেক বাকি। হেডরিশ গোপনে যে ল্যাবরেটরি স্থাপন করেছিল সে ল্যাবরেটরিতে তৈরি হতে লাগল রুশ কাগজ, রুশ সমর নায়কদের নাম ছাপানো লেটারহেড; রুশ ডাক টিকিট, খাম এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি ব্যাপার। বাকি রইল স্বাক্ষর জাল করা।

এই কাজটি কিছুতেই সন্তোষজনকভাবে করা যাচ্ছিল না। ল্যাবরেটরিতে যারা কাজ করছিল কাজটি তারা কিছুতেই নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতে পারছিল না। স্বাক্ষর একেবারে নিখুঁত হওয়া চাই, আসলের মতো অবিকল, এমন কি কলমের সূক্ষ্মতম আঁচড়টিও থাকা চাই। যত চিঠি পাওয়া গিয়েছিল সব চিঠি টাইপ করা নয় যদিও চিঠি টাইপ করাবার জন্যে পুরনো রাশিয়ান টাইপরাইটার সংগ্রহ করা হয়েছিল। তুখাশেভস্কি এবং আরও কেউ কেউ নিজের হাতে চিঠি লিখতেন। এই কাজটি সম্পন্ন করবার ভার দেওয়া হল ফ্রেডরিক বারজারের ওপর।

' বারজারকে এমন একজন জালিয়াত খুঁজে বার করতে হবে যে অপরের হাতের লেখা ও স্বাক্ষর অবিকল জাল করতে পারে। জার্মানিতে কোথায় এমন একজন ওস্তাদ লোক বসে আছে কে জানে ? আছে নিশ্চয়। তার ঠিকানা তো জানা নেই। তবুও অন্ধকারে ছুঁচ খুঁজতে বারজার ঝাঁপিয়ে পড়ল। নতুন জার্মানি গঠনে তখন নাৎসীদল মেতে উঠেছে। বিরাট কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে।

অবশেষে পাওয়া গেল। ঠিক যেমনটি দরকার তেমনটি। সেই-রকম একজন লোক আছে। কিন্তু কি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সে করবে তা সে ঘুণাক্ষরেও জানতে পারবে না। বলতে গেলে লোকটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল।

সেই ওস্তাদ লোকটির নাম ম্যানফ্রেড পুটজিগ। বার্লিনের অ্যাড-লারসাফ পাড়ায় তার রবার স্ট্যাম্পের দোকান। লোকটির বয়স হয়েছে। নাৎসী পার্টির মেম্বার। পার্টিরকোন ক্রিয়াকলাপে অংশ গ্রহণ না করলেও নিয়মিত চাঁদা দেয় তাই সভ্য তালিকা থেকে নামটা খারিজ হয় নি।

চোখে রুপোর ফ্রেমের চশমা লাগিয়ে নিজের ছোট্ট দোকানে টুলের উপর বসে নিজের মনে কাজ করে যায় কিন্তু সে নিজে তার নৈপুণ্য সম্বন্ধে সজাগ নয়। ছোটোখাটো মানুষ, মাথার চুল অকালে পেকে গেছে। সরু গলায় আস্তে আস্তে নাক টানতে টানতে কথা বলে। পরনে ঢিলাঢালা পোষাক, তবে দৃষ্টি খুব প্রখর। হাত চলে দ্রুত।

এহেন গুণী লোক ম্যানফ্রেড পুটজিগকে খুঁজে বার করার সমস্ত কৃতিত্ব বারজারের। কোথায় কার কাছে নাম শুনে ফ্রেডরিক বারজার একদিন ম্যানফ্রেডের রবার স্ট্যাম্পের দোকানে গিয়ে হাজির।

বারজার তার পরিচয়-চিহ্ন দেখিয়ে ম্যানফ্রেডকে বলল, পার্টির জন্য একটা খুব জরুরী কাজ খুব গোপনে করতে হবে এবং কাজটা সাধারণ একটা কাজ নয়।

ম্যানফ্রেড বলল, আপনি যেই হন না মশাই আপনার মুখের কথায় আমি কাজ করতে পারব না। আমার চাই লিখিত অর্ডার, নইলে টাকা আদায়ে অসুবিধে হয়, আমার মশাই নানা ঝামেলা হাতে অনেক কাজ আছে···

বারজার কিন্তু রাগ করল না, মনে মনে খুশি হল। সে বুঝল যে এই লোকটি গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারবে। বারজার তাকে নিজের গাড়িতে তুলে নিয়ে সোজা এস ডি হেডকোয়ার্টারে স্বয়ং হেডরিশের কাছে নিয়ে গেল।

এর আগে ম্যানফ্রেড কখনও এতবড় অফিসে ঢোকে নি বা এতবড় একজন অফিসারের সঙ্গে কথা বলে নি। হেডরিশের বাজ-পাখীর মতো নাক আর চোখ, কড়া কণ্ঠস্বর শুনে সে হকচকিয়ে গেল। বেচারি ভয়ে কাঁপতে লাগল।

কর্কশ কণ্ঠে হেডরিশ বলল: তোমার কাঁপুনি থামাও তো হে, যা বলছি মন দিয়ে শোনো। তোমাকে কয়েকটা স্বাক্ষর দেওয়া হবে, সেগুলো এমনভাবে নকল করবে যে আসলের সঙ্গে যেন কোন তফাত না থাকে, নকলটা আসল বলে মনে হবে, তারপর সেগুলির রবার স্ট্যাম্প তৈরি করবে। ভাল করে, মন দিয়ে কাজ করবে, আর যত দিন তুমি আমাদের কাজ করবে ততদিন আর অন্য কোনো কাজ করতে পারবে না; বুঝেছ?

আজ্ঞে বুঝেছি হেয়র জেনারেল।

আর শোনো, এই কাজ অত্যন্ত গোপনে, করতে হবে, কেউ জানবে না, কেউ শুনবে না, যদি কোনোভাবে ফাঁস হয় তোমাকে মরতে হবে, বুঝেছ, মাথায় ঢুকেছে?

আজ্ঞে বুঝেছি হেয়র জেনারেল, তা কৈ কাজ দিন।

দিচ্ছি কিন্তু তুমি কি মনে করেছ যে কাজ নিয়ে তোমার দোকানে বসে কাজ করবে? তা হবে না, তোমাকে এখনি এক জায়গায় পাঠিয়ে দিচ্ছি সেখানে বসে কাজ করবে, কাজ

শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেইখানে থাকবে, খাবে, ঘুমোবে, হ্যাঁ, পয়সা পাবে বৈকি।

জার্মান ও রুশ সেনাপতিদের মধ্যে যে সব চিঠি চাপাটি চলছিল, সেইগুলি থেকে বেছে বেছে দুই দেশের সেনাপতিদের স্বাক্ষরের ফটো-কপি ম্যানফ্রেডকে দেওয়া হল। ম্যানফ্রেড সত্যিই দক্ষ কারিগর। সে ইতিমধ্যে দোকান থেকে নিজের সরঞ্জাম আনিয়ে নিয়েছিল। সে নিপুণ হাতে সাত দিনের মধ্যে কাজ শেষ করে দিল।

আশ্চর্য! কাজ দেখে সবাই হতবাক। একেই বলে জার্মান নৈপুণ্য।

রবার স্ট্যাম্প করিয়ে নেওয়ার ওদের একটা মতলব ছিল। অপরের সই দেখে দেখে কয়েকবার চেষ্টা করে অনেকে জাল করে দিতে পারে কিন্তু তাতে অনেক সময় ত্রুটি থেকে যেতে পারে কিন্তু রবার স্ট্যাম্পে সে ত্রুটি থাকবে না। সব স্বাক্ষরই এক হবে।

যদি কিছু ত্রুটি থেকেও যায় তাতে কিছু যাবে আসবে না কারণ স্ট্যালিনের কাছে পাঠানো হবে চিঠির ফটোকপি। সামান্য ত্রুটি থাকলেও তা ফটোকপি করবার সময় চাপা পড়ে যাবে।

রবার স্ট্যাম্প থেকে ছাপ তোলবার জন্য ল্যাবরেটরিতে স্পেশাল কালি তৈরি করা হল। কাজটা যেন নিখুঁত করা হয়।

দুই পক্ষের সেনাপতিদের যে সব চিঠি স্ট্যালিনের কাছে পাঠানো হবে সেগুলি পড়ে স্ট্যালিন যেন সহজে ও স্পষ্ট বুঝতে পারে যে তার সেনাপতিরা জার্মান সেনাপতিদের সঙ্গে তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে। এই ধরনের কিছু চিঠির মুসাবিদা হেডরিশ ইতিমধ্যে করিয়েরেখে ছিল।

চিঠিগুলি যেন মার্শাল তুখাশেভস্কি এবং অন্যান্য রুশ সেনাপতিরা জার্মান হাইকমাণ্ডের সেনাপতিদের লিখছে। তারা যেন লিখছে যে তারা এই নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী স্ট্যালিনকে সরাতে চায় এবং তজ্জন্য জার্মানদের সাহায্য দরকার। জার্মান সেনাপতিরাও যেন তাদের সমর্থন জানিয়ে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। পরিবর্তে জার্মান-

দের উক্রেনের যে ভূখণ্ড দেওয়া হবে, রুশ পক্ষ থেকে তারও উল্লেখ আছে।

হেডরিশ তার কাজ শেষ করে সেই সব চিঠি সাজিয়েগুছিয়ে লাল রঙের একটি ফাইলে উত্তমরূপে পাঞ্চ করে হিটলারেব অনুমোদনের জন্যে নিজে সেটি নিয়ে গেল।

ফাইলের চিঠিগুলি পড়ে এবং সেগুলি পরীক্ষা করে হিটলার সন্তুষ্ট।

এইবকম গুরুত্বপূর্ণ একটা ফাইল তো আর সবাসরি স্ট্যালিনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যায় না তাতে স্ট্যালিনেব সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। এজন্যে প্রস্তুতি চাই, ক্ষেত্র প্রস্তুত কবতে হবে।

পূর্ব প্রাশিয়াতে কনিংস্‌বার্গেব কাছে একটি রেডিও ট্রান্সমিটার বসানো হল। সেই ট্রান্সমিটার থেকে বাশিয়াতে 'অদৃশ্য জার্মান এজেন্টদের' জন্যে উদ্দেশ কবে সহজবোধ্য সাংকেতিক ভাষায় ব্রডকাষ্ট চলতে থাকল।

রুশ গুপ্তচর বিভাগ সেইসব ব্রডকাষ্ট শুনে অনুমান করল যে গভীর একটা ষড়যন্ত্র চলছে। এই ষড়যন্ত্রে উচ্চপদস্থ রুশ ও জার্মান মিলিটারী জড়িত। কিন্তু ষড়যন্ত্রটা কী? স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।

প্রথম ধাপ তো আগেই তৈরি করা হয়ে গেছে, জাল চিঠি, জাল স্বাক্ষর ইত্যাদি গ্রথিত লাল ফাইল যা গনগনে আগুনের মত লাল।

দ্বিতীয় ধাপ হল কনিংসবার্গে রেডিও ট্রান্সমিটার এবং অদৃশ্য এজেন্টদের উদ্দেশ্যে সহজবোধ্য সাংকেতিক ভাষায় ভুয়ো সংবাদ প্রেরণ।

এইবার তৃতীয় ও শেষ ধাপ।

হেডরিশের অ্যান্টি-সোভিয়েট এসপিওনেজ সেকশনের প্রধান হল কর্ণেল হারমান বেরেণ্ডস। বেরেণ্ডসকে পাঠানোহল চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ শহরে।

প্রাগে পৌঁছে বেরেণ্ডস একটা ছদ্মনাম গ্রহণ করল এবং চেক

রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট ডঃ এডওয়ার্ড বেনেসের সঙ্গে দেখা করল। দেখা করার ব্যাপারে একজন চেক বেরেণ্ডসকে সাহায্য করেছিল।

ডঃ বেনেসকে বেরেণ্ডস বলল যে ক্রেমলিনের বিরুদ্ধে রুশ ও জার্মান সেনাপতিরা গভীর এক চক্রান্তে লিপ্ত। কাগজপত্রে এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে।

এই সাংঘাতিক খবর শুনে ডঃ বেনেস মুষড়ে পড়লেন। তিনি জানতেন যে চেকোস্লোভাকিয়ার বিরাট কারখানা স্কোডা-এর ওপর হিটলারের লোভ আছে এবং সেই কারখানার লোভে হিটলার সারা চেকোস্লোভাকিয়া গ্রাস করতে প্রস্তুত। সেজন্যে তিনি স্ট্যালিনের ওপর নির্ভর করতেন। স্ট্যালিন তাঁকে ও তাঁর দেশকে বাঁচাতে পারেন।

এ কি ভয়ংকর সংবাদ!

কিন্তু কোথায় সেই প্রমাণ? কোথায় সেই সব কাগজপত্র? ডঃ বেনেস স্বভাবতই এই প্রশ্ন করলেন।

বেরেণ্ডস উত্তর দিল, কাগজপত্র সবই রেডি আছে, জার্মান ওয়ার মিনিস্ট্রির একজন বিশ্বাসঘাতক কেরানী সেইসব কাগজ হস্তগত করেছে। মূল কাগজগুলি নয়। তবে মূল কাগজ ও চিঠিপত্তরের সে ফটো কপি করিয়েছে বা নিজেই করেছে। টাকা পেলে সে এইসব তথ্য বেচে দেবে।

ডঃ বেনেস কপালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন তারপর স্থির করলেন যে এই ষড়যন্ত্র স্ট্যালিনকে জানানো তাঁর কর্তব্য।

স্ট্যালিন সব শুনে বললেন যে তিনি নিজে সেই সব কাগজগুলি দেখতে চান। বার্লিনে সোভিয়েট দূতাবাসের একজন কূটনীতিক সেই কাগজগুলি সংগ্রহ করবার বিষয়ে কথাবার্তা বলবে।

বার্লিনে সোভিয়েট দূতাবাসের সেই কূটনীতিকের নাম দেওয়া হল 'রুডলফ'। লোকটি কূটনীতিক বলে নিজের পরিচয় দিলেও আসলে সে স্ট্যালিনের সিক্রেট সার্ভিস ওগপু-এর একজন তুখোড়

স্পাই। আর জার্মান ওয়ার মিনিস্ট্রির সেই বিশ্বাসঘাতক কেরানীর ভূমিকা দেওয়া হল ফ্রেডরিক বারজারকে।

বারজারই যেন সেইসব কাগজ চুরি করে ফটোস্টাট কপি করে রেখেছে। বারজার প্রথমে রুডলফকে যৎসামান্যই দেখাল। যা দেখাল তাতেই রুডলফের চোখ কপালে উঠল। বারজার বলল যে এরপর তার হাতে যা আছে তা তো টি-এন-টি বোমা।

কত দিতে হবে? রুডলফ জিজ্ঞাসা করল।

তিরিশ লাখ রুবল। মানে তখনকাব দামে মোটামুটি দু লাখ টাকা।

ঠিক আছে, সব কাগজপত্র নিয়ে এস, রুডলফ বলল।

রুডলফ চিঠিপত্র, কাগজ, স্বাক্ষর সব কিছু ভাল করে দেখে তিরিশ লাখ রুবলেব কড়্‌কড়ে নতুন নোট গুণে দিয়ে লাল ফাইলটি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মসকো চলে গেল অর্থাৎ রাইনার্ড হেডরিশ ক্রেমলিনে একটি টাইম বোমা বসিয়ে দিল।

হেডরিস অর্ডার দিল যে মসকোতে জার্মান দূতাবাসের সঙ্গে বার্লিনের এস ডি হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে সবাসরি একটা রেডিও সার্কিট বসানো হক এবং অবিলম্বে তা বসানো হল। তখনো হটলাইন কথাটা চালু হয় নি। বার্লিন ও মসকোর মধ্যে একটা হটলাইন চালু হল।

এই মারাত্মক লাল ফাইল হস্তান্তর হবার পাঁচ দিন পরে টাইম বোমার প্রতিক্রিয়া জানা গেল।

১৯৩৭ সালের ৫ই মে তারিখের প্রাভদায় একটি খবর প্রকাশিত হল। খবরটিতে জানানো হল যে ইংলণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জের অভিষেক উপলক্ষে তুখাশেভস্কির পরিবর্তে মার্শাল অরলভ সোভিয়েট সরকারের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

১০ই মে তারিখে হটলাইন মারফত হেডরিশ জানতে পারল যে রেড আর্মির চিফ অফ স্টাফ পদ থেকে মার্শাল তুখাশেভস্কিকে

অপসারণ করা হয়েছে এবং ভলগাতে তাকে একটি অধস্তন পদে বসানো হয়েছে।

এই অধস্তন পদে তুখাশেভস্কিকে বসবার আগে আরও অনেক ঘটনা দ্রুত ঘটে গেল। উচ্চপদস্থ সেনাপতিদের ওগপু একে একে ধরে জেলে পুরতে লাগল। কোন কারণ নেই। সারা রাশিয়া আতংকিত। রাশিয়ার ওপরের আকাশ বুঝি এইবার ভেঙে পড়বে।

যে খবরটির জন্যে হেডরিশ সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল সে খবর জানা গেল ১১ই জুন রাত্রে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের মার্শাল, প্রতিরক্ষা বিভাগের ভাইস কমিশনার, রেড আর্মির চিফ অফ স্টাফ এবং অর্ডার অফ লেনিন দ্বারা ভূষিত মিখাইল তুখাশেভস্কি এবং আরও সাতজন উচ্চপদস্থ সেনাপতিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ও সুপ্রিম কোর্টের মিলিটারি কলেজিয়মে তাদের বিচারও হয়ে গেছে।

পরদিন জানা গেল যে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে তাদের দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

উল্লাসে রাইনার্ড হেডরিশ বোধ হয় ফেটে পড়বে। হাসতে হাসতে সে খবর জানাতে গেল হিটলারকে।

সেই সবে শুরু। প্রচণ্ড ভূমিকম্পে যেন সোভিয়েট সামরিক বিভাগ কেঁপে উঠল। নির্বিচারে ও অবাধে হত্যাকাণ্ড চলতে লাগল। মার্শাল, আর্মি কমাণ্ডার, ফোর কমাণ্ডার, ব্রিগেড কমাণ্ডার, ভাইস কমিশনার, ডিস্ট্রিক্ট কমাণ্ডার, সুপ্রিম মিলিটারি কাউনসিলের মেম্বার, জেনারেল, কর্নেল এবং অধস্তন অফিসার মিলিয়ে হাজারে হাজারে হত্যালীলা চলতে লাগল।

এই হত্যালীলার প্রতিক্রিয়া হল সুদূর প্রসারী।

এক কথায় বলা চলে যে সুসংগঠিত, সুসংবদ্ধ ও শক্তিশালী সোভিয়েট আর্মি দুর্বল হয়ে পড়ল। সন্দেহের বিষ ছড়িয়ে পড়ল ব্যারাকে ব্যারাকে। যারা বেঁচে গেল তারাও আর পরস্পরকে বিশ্বাস

করে না। হিটলার যা চাইছিল তাই হল। ফলে ১৯৩৯ সালে রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে কোনো অসুবিধে হল না। স্ট্যালিন সহজেই রাজি হল।

হিটলার এখন নিশ্চিন্ত। সে যদি তখন পশ্চিম ইউরোপ তথা ফ্রান্স আক্রমণ করে তাহলে তার পিঠে কেউ ছুরি বসাবে না।

সোভিয়েট আর্মি যে কত দুর্বল হয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ফিনল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধে। ফিনল্যাণ্ড ছোট একটা দেশ জনসংখ্যা মাত্র চার লক্ষ। সেই দেশের সঙ্গে লড়াই করতে রাশিয়া নাস্তানাবুদ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সৈন্য সংখ্যার চাপে ফিনল্যাণ্ডকে কব্জা করতে পেরেছিল।

সোভিয়েট সামরিক বিভাগে হত্যালীলা থেকে তুখাশেভস্কি এবং জার্মান মিলিটারি কর্তৃক ট্রেনিং প্রাপ্ত কয়েকজন জেনারেল স্ট্যালিনের রোশানল থেকে ভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়েছিল। এদের মধ্যে ছিলেন মার্শাল জুকভ এবং রকসোভস্কি।

নাৎসী সৈন্যবাহিনী যখন সোভিয়েট রাশিয়াকে কব্জা করে ফেলেছে, পরাজয় অনিবার্য তখন এই দুজন সেনাপতি পরাজয়ের হাত থেকে সোভিয়েট রাশিয়াকে বাঁচায়।

হেড্রিশের সেই লাল ফাইলের জন্যে কত রুশ মরেছিল জানেন কি? মোটমাট ৭৫ লক্ষ! কেউ বলে আরও বেশি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে গুপ্তচরবৃত্তির কলাকৌশল সম্পূর্ণ পালটে গেছে। প্রথমতঃ নারী অপেক্ষা পুরুষ গুপ্তচরের ওপর বেশি আস্থা স্থাপন করা হচ্ছে এবং আজ তাদের সংখ্যাও অনেক বেশি।

নানারকম যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে, আবিষ্কৃত হয়েছে শক্তিশালী ক্যামেরা। কয়েক শত মাইল দূরে নিজের ঘরে বসে দু'জন লোক কথা বলছে, তাদের কথাবার্তা আপনি নিজের ঘরে বসে রেকর্ড করতে পারবেন। আকাশে বেশ কয়েক মাইল ওপরে উঠে

আপনি জমিতে পড়ে থাকা একটা ফুটবলের ছবি তুলতে পারবেন।

তাছাড়া স্পাইদের ট্রেনিং দেওয়ার ধারাও আজকাল পালটে গেছে। আপনারা যারা সিনেমায় স্পাই ছবি দেখেছেন তাঁরা যদি তাদের জীবন সম্বন্ধে কোনো ধারণা করে থাকেন তাহলে ভুল করবেন। তাদের জীবন আরও কঠোর।

এবার একজন ইজরেলি গুপ্তচরের কথা শোনাচ্ছি। ইজরেলি গুপ্তচরের কথা আপনারা বোধ হয় বেশি শোনেন নি। এই লোকটির বিষয় পড়লে আপনি বিস্মিত হবেন।

সিরিয়ার সীমান্তরেখা ঘেঁসে মরুব মাঝে ইজরেলের শ্যামল উপত্যকা হুলে ভ্যালি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমতল উর্বর জমি, মাঝে মাঝে ক্ষেত খামাব আব ছোট ছোট গ্রাম। ছায়া সুনিবিড় শান্তিব নীড়।

মাঝে মাঝে অশান্তিব চিহ্নও দেখা যায়। সীমান্তের অপর প্রান্তে সিরিয়ার ভেতর রয়েছে হাইটস অফ গোলান বা জোলান, খবরের কাগজের মাধ্যমে যা এখন গোলান হাইটস নামে পরিচিত। আমরা গোলান লিখব। ইজরেলের ঐ শ্যামল উপত্যকা হুলে ভ্যালি থেকে গোলান হাইটস এর উচ্চতা অনেক বেশি। এখান থেকে সিরিয়ার সৈন্যরা হুলে ভ্যালির দিকে কামান বন্দুক তাক করে মাঝে মাঝে লক্ষ্যভেদ অভ্যাস করে। হুলে ভ্যালির গ্রামের ওপর এসে গোলা ফেটে পড়ে কিংবা ট্র্যাক্টর চালনারত কোন ইজরেলির দেহে দূরপাল্লার বাইফেলের গুলি বিদ্ধ হয়।

এই গোলান হাইটস-এ সিরিয়া দুর্ভেদ্য এক দুর্গ নির্মান করেছে। এই দুর্গের ভেতর ঢুকতে পারে বা দুর্গকে ভেঙ্গে চুরমার করতে পারে এমন শক্তি নাকি মানুষের নেই। এই দুর্গ নির্মান সম্ভব হয়েছে সোভিয়েট রাশিয়ার সহায়তায়। রেড আর্মির এঞ্জিনিয়াররা এসে এই দুর্গ তৈরি করে দিয়ে গেছে। কাজ শেষ করে যাবার সময় তারা

বলে গেছে—যা তৈরি করে দিয়ে গেলুম তা দুর্গ নির্মাণের বিজ্ঞানে শেষ কথা। এই দুর্গ অজেয়।

একদিন কিন্তু সেই অসম্ভবও সম্ভব হল।

১৯৬৭ সালের জুন মাসের এক শুক্রবার ঠিক বেলা সাড়ে দশটায় ইজরেলি সেনাবাহিনীর এই দুর্গ আক্রমণ এবং চারদিন যুদ্ধেব পর দুর্গ জয় কবে নিল। এই চারদিন যুদ্ধের পশ্চাতে আছে ইজবেলের দশ বছবের প্রস্তুতি। এই একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে ইজরেলের সৈন্যদেব দশ বছর ধরে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। সামরিক ধৈর্যেব ইতিহাসে এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত।

বিমান ও স্থলবাহিনী একযোগে আক্রমণ করেছিল এই দুর্গ, তবে স্থলবাহিনীর ভূমিকাটাই বেশি। আটাশ শত সৈন্য আব দুশো ট্যাংক দুর্গ আক্রমণ করেছিল।

গোলান দুর্গ পর্যন্ত বাস্তা ছিল ট্যাংক যাবাব পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। ইজরেলি বিমানবাহিনী যে সময় দুর্গের ওপর বোমা ফেলছিল এবং সিবিয়া যে সময় সেই বিমান আক্রমণ ঠেকাতে ব্যস্ত সেই সময়ে ট্যাংক যাবার জন্যে ইজরেলের কুড়িটি বুলডোজার দ্রুত রাস্তা তৈরি করছিল।

সিরিয়াও সহজে ছাড়েনি। তীব্র যুদ্ধ চলেছিল দুই পক্ষে। চতুর্থ দিনে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গের পতন হয়। পতনের পর দেশ বিদেশের সামরিক বিশেষজ্ঞ এবং সাংবাদিকদের গোলান দুর্গ দেখান হয়। এই দুর্গের নির্মান কৌশল সকলকে বিস্মিত করে এবং এমন দুর্ভেদ্য দুর্গেরও পতন তাদের অবাক করে। ইজরেলি মুখপাত্র সগর্বে বলে যে এই জয় সহজে লাভ করা যায় নি। এর পশ্চাতে আছে ইজরেলি সৈন্যদের দৃঢ় মনোবল, অসাধারণ সাহস আর এই বিশেষ দুর্গ জয়ের জন্য বিশেষ ট্রেনিং ও গত দশ বছরের গোপন প্রস্তুতি।

কথাটা আংশিক সত্য। মুখপাত্রটি বলে নি যে এই দুর্গের নকশা তাদের হস্তগত হয়েছিল সেই দশ বছর আগে এবং পরে প্রতিটি সৈন্যকে

সেই নকসা উত্তমরূপে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কোথায় কোথায় লুকানো কামান আছে কিংবা কোথায় আছে দুর্গের পাওয়ার হাউস বা জল ভাণ্ডার এসবই ইজরেলি সৈন্যরা দুর্গে প্রবেশ করার আগেই জানত।

গোলান দুর্গ অধিকার বিরাট সামরিক জয় হিসেবে চিহ্নিত এবং এটি গুপ্তচর বৃত্তিরও এক অসাধারণ সাফল্য। এটি হল সাধারণ এক ইহুদি নাগরিকের কাহিনী, সে সিরিয়ার সমস্ত গোপন সামরিক তথ্য সংগ্রহ করেছিল এবং ইজরেলকে জানিয়েছিল। বর্তমানকালে এই লোকটির তুল্য আর একজন গুপ্তচরেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, এবেল, ফুকস বা কিম ফিলবিও নয়।

১৯৫৬ সালের যুদ্ধে মিশর হেরে যায় ইজরেলের কাছে। ১৯৫৭ সালের গোড়ায় বিক্ষুব্ধ নাসের মিশর থেকে ইহুদিদের বিতাড়িত করে।

দলে দলে ইহুদিরা আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে এসে ভিড় জমায়। প্রতীক্ষা করে জাহাজের ডেকে দাঁড়াবার স্থানের জন্যে। আলেক-জান্দ্রিয়া থেকে অনেকে এসে নামে ইজরেলের টেল আভিভ বন্দরে।

টেল আভিভ বন্দরে যে সব ইহুদি শরণার্থী নামল তাদের মধ্যে ছিল ৩৩ বৎসর বয়স্ক এলি কোহেন, তার বৌ নাদিয়াদ আর দুটি সন্তান। এলি কোহেনের চেহারায় কোন বৈশিষ্ট্য নেই, পাঁচজনের ভিড়ে যে কোন দেশে সে অনায়াসে মিশে যেতে পারে। ইজরেল, সিরিয়া, জর্ডান, সৌদি আরব, যে কোন দেশের নাগরিক বলে তাকে চালানো যায়। গুপ্তচরের আদর্শ চেহারা, তবে সে এক হিসেবে স্বতন্ত্র। তার দৃষ্টি চঞ্চল, সব কিছু সে লক্ষ্য করে, মনে রাখে। তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অবহেলা করার মত নয়। এ ছাড়া সে চার পাঁচটি ভাষা শিখেছিল। এইটুকু মাত্র তার সম্বল, আর সম্বল ছিল একটি মাত্র চামড়ার ব্যাগ। যা কিছু বৈষয়িক সম্পদ সবই তার মধ্যে ভরা।

আপাততঃ একটি শরণার্থী ক্যাম্পে তারা আশ্রয় পেল। কিন্তু এখানে তো চিরদিন থাকা চলবে না। কাজ করতে হবে। কিন্তু কোথায় কাজ, ছোট দেশে সারা পৃথিবীর ইহুদিদের ভিড়। চাকরি পাওয়া কঠিন।

উদ্যমী কোহেন শেষ পর্যন্ত একটা চাকরি জুটিয়ে নিল! টেল আভিভে একটা দোকানে খাতা লেখার কাজ। সামান্য আয়। একখানা মাত্র ঘর ভাড়া নিয়ে স্ত্রী ও বাচ্চা দুটিকে নিয়ে ক্যাম্প থেকে সেখানে কোহেন উঠে এল।

খাতা লেখার কাজটাও একদিন গেল। ব্যবসা মন্দা। ভালই হল। নইলে বোধহয় ভাল একটা চাকরি জুটত না। এই ভাবেই দু'বছর কাটল। ইতিমধ্যে সে উত্তমরূপে স্থানীয় ভাষায় কথা বলা রপ্ত করেছে এবং ইজরেল তার জন্মভূমি না হলেও এই নতুন দেশের প্রতি তার একটা মমত্বভাব এসেছে। এতদিন পরে ইহুদিরা নিজস্ব একটা দেশ পেয়েছে।

কোহেন ও তার বৌ নাদিয়াদের বেশ কিছু বন্ধু জুটেছে। ওরাও পার্টি দেয় বা অন্য পার্টিতে যায়। যে কোন পার্টিতে এলি কোহেন জনপ্রিয়। সে অনেকের বাচনভঙ্গি ও মুদ্রাদোষ ইত্যাদি নিখুঁত ভাবে নকল করতে পারে—বিশেষ করে নাফের ও দু'গলকে সে হুবহু নকল করতে পারে।

টেল আভিভে এলি কোহেন এখন আর নেহাত অচেনা নয়। সে যে ব্যক্তি বিশেষকে অনুকরণ করতে পারে এবং পাঁচটি ভাষায় কথা বলতে পারে এ খবর অনেকেই জানে।

এই খবরটা বোধহয় ইজরেলের গুপ্তচর কেন্দ্র শিন বেত-এ পৌঁছে ছিল। সুসংগঠিত ও দক্ষ কেন্দ্ররূপে শিন বেত-এর খ্যাতি সারা পৃথিবীতে। অন্য দেশের গুপ্তচর অপেক্ষা শিন বেত-এর গুপ্তচরদের একটা বিশেষ সুবিধে আছে। ইজরেলের যারা নাগরিক তারা এসেছে বিভিন্ন দেশ থেকে। সেই জন্যে এরা যে কোন দেশের জনতার সঙ্গে

বেমালুম মিশে যেতে পারে। এদের চেহারায় ইজরেলি ছাপ নেই।

শিন বেত-এর বয়স খুব বেশি নয়। ইজরেলের নিজের বয়সই তো বেশি নয়।

১৯৫০ সালে পাশেই শত্রু রাজ্য সিরিয়াতে প্রচুর পরিমাণে রুশ অস্ত্রশস্ত্র এসে গেল। এত অস্ত্র যে সিরিয়ার সৈন্যদের তিনবার ডুবিয়ে দিতে পারে। আর সেই সঙ্গে এল দলে দলে রুশ মিলিটারি টেকনিশিয়ান।

এই সময়েই ইজরেল একটি গুপ্তচর সংস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল। রুশ টেক্‌নিশিয়ানরা কি করছে, কি কি সমর সম্ভার আসছে জানা দরকার। গঠিত হল গুপ্তচর সংস্থা শিনবেত।

ইজরেলের উত্তরে সিরিয়ার হাইটস অফ গোলানে রেড আর্মির এঞ্জিনিয়াররা পাহাড় কেটে কি তৈরি করছে সেটা উত্তমরূপে জানা দরকার। অতএব সিরিয়াতে একজন সুচতুর গুপ্তচর পাঠাতে হবে এবং সেই চর নির্বাচিত হল এলি কোহেন। শিন বেত-এর লোকেরা তাকে একদিন স্রেফ রাস্তা থেকে হেডকোয়ার্টারে তুলে আনলো। তারা লোক চিনতে ভুল করে নি। ঠিক লোকই তারা নির্বাচন করেছিল। এলি কোহেন শিনবেতকে নিরাশ করে নি।

নাদিয়াদকে জানানো হল এলির নতুন চাকরি হয়েছে। তবে কি চাকরি তার আভাস মাত্রও নাদিয়াদ জানল না। নতুন চাকরির জন্যে এলিকে দীর্ঘদিন বাড়ি ছেড়ে থাকতে হবে এবং সে মাসে মাসে এসে বৌ ও বাচ্চাদের দেখে যাবে।

শুরু হল কঠোর ট্রেনিং। শিন বেত-এর এক গোপন বিভাগে কোহেনকে নানারকম বিদ্যা শেখানো আরম্ভ হল। ফটোগ্রাফি, মাইক্রোফিল্ম, কোড, রেডিও মারফত সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণ, রেকর্ডিং ইত্যাদি নানারকম কারিগরি বিষয়। এ ছাড়া তাকে কোরান অধ্যয়ন করতে হত এবং শুদ্ধ আরবি ভাষায় কোরানের উচ্চারণ শিখতে হত।

কোহেন কথা বলত মিশরীয় আরবী ভাষায় কিন্তু এখন তাকে সে ভাষা ও উচ্চারণ ভুলতে হল, নির্ভুলভাবে আয়ত্ত করতে হল সিরিয়াতে প্রচলিত আরবি। শুধু তাই নয়, তার কাজকর্ম, কথাবার্তাও হাবভাবে সিরিয় চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে হল।

তার শেষ ট্রেনিংটি বেশ কৌতুহলোদ্দীপক। সিরিয়ার কোন গ্রামের কাল্পনিক একটি মানুষের চরিত্র তাকে পড়তে দেওয়া হল। সেই চরিত্র তাকে মুখস্থ করতে হল। সে যেন সিরিয়ার সেই গ্রামে তার বাল্যকাল অতিবাহিত করেছিল। সেই বাল্যকালের ইতিহাস যদি বিভিন্ন ব্যক্তিকে বলতে হয় তাহলে যেন কোথাও কোন অসঙ্গতি বা গলদ ধরা না পড়ে।

ট্রেনিং শেষ হল। এখন আর সে এলি কোহেন নয়, সে একজন ধনী সিরিয় ব্যবসায়ী, অবিবাহিত, নৈশ জীবনে অনুরক্ত, আরব দেশ-প্রেমিক, ইজরেল তার দু'চক্ষের বিষ। তার নতুন নাম কামাল তাবেত। এই নামেই তার পাসপোর্ট আছে। এইবার সে নতুন কাজে যাবে। যাবার আগে সে নাদিয়াদ ও বাচ্চাদের দেখে গেল। এ হল ১৯৬০ সালের কথা।

পৃথিবীর সব বড় বড় বন্দরে সিরিয় ব্যবসায়ীদের একটি করে সম্প্রদায় আছে। আরজেনটিনার প্রধান বন্দর বুয়েনস এয়ারসেও সিরিয় ব্যবসায়ীদের একটি সম্প্রদায় আছে। এরা আরজেনটিনার জীবনের সঙ্গে মিলেমিশে থাকলেও স্বদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। এরা সকলেই ধনী।

ব্যবসা সূত্রে কামাল তাবেত ১৯৬১ সালের জানুয়ারি মাসে বুনেয়স এয়ারসে হাজির হল। ইউরোপে সে দীর্ঘদিন বাস করেছে, পৃথিবীব্যাপী তার ব্যবসা। এখানে এসে সে আমদানী রপ্তানির ব্যবসা আরম্ভ করল। ছোটখাটো নয়, বেশ বড়ই বলতে হবে।

কামাল তাবেত স্থানীয় সিরিয় নেতাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে লাগল। তাদের সঙ্গে নামাজের জন্য মসজিদেও যেতে লাগল।

আলাপ পরিচয়ের সময় ইজরেলের নাম উঠলে সে যেন ক্ষেপে উঠত। ইজরেলের নাম সে আদৌ বরদাস্ত করতে পারত না।

তাবেতের সঙ্গে এইখানেই বন্ধুত্ব হল সিরিয়াব দূতাবাসেব মিলিটারি পরামর্শদাতা আমিন অল হাফেজের সঙ্গে।

কিছুদিন কাটল। তাবেত একবাব বাড়ি যেতে চায় তবে শীঘ্রই ফিরে আসবে। আরজেনটিনার নাগরিক হবাব জন্যে সে আবেদন করেছিল। সে আবেদন গ্রাহ্য হয়েছিল এবং সিরিয়া যাবার জন্যে আরজেনটিনা থেকে তাকে একটি পাসপোর্টও দেওয়া হল।

ঠিক এক বছর পবে ১৯৬২ সালের জানুয়ারি মাসে দেশে যাবার জন্যে তাবেত জাহাজে উঠল। স্থানীয় আরব বন্ধুরা তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে জাহাজঘাটায় জমা হয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেব গোড়াব দিকে গুপ্তচরবৃত্তি সম্বন্ধে একখানি রুশ কেতাব লেখা হয়েছিল। সেই কেতাবের নাম ছিল রিক্রুটিং অ্যাণ্ড কণ্টাক্ট প্রসিডিওর। এই বই নাৎসীরা একখণ্ড হস্তগত করেছিল এবং অনুবাদ করে নাৎসী গুপ্তচরদের পড়তে দিত। শিন বেত-এর গ্রন্থাগারেও সেই বই ছিল এবং এলি কোহেনকেও পড়ানো হয়েছিল। সেই কেতাবেব কোন এক পৃষ্ঠায় ইটালিক্স্ অক্ষরে লেখা ছিল: শত্রুপক্ষের ওপরওয়ালাদের সঙ্গে গুপ্তচরকে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে কারণ সংবাদেব উৎস হল সেইখানে।

একই জাহাজে দেশে ফিরছিল একজন ধনী সিরিয় উট ব্যবসায়ী। তার নাম শেখ মজিদ তল আবদ। সে বিলিতি পোষাক পরে। তার চেহারা দেখলেও তার সঙ্গে কথা বললে বোঝা যায় সে লোকটি প্রভাবশালী, ওপর মহলে ঘনিষ্ঠতা আছে এবং ঝানু ব্যবসায়ী।

আরদের সঙ্গে কামাল তাবেতের খুব বন্ধুত্ব হয়েছে।

জাহাজ যখন লেবাননের বন্দর বেইরুটের কাছে এগিয়ে আসছে তখন তাবেতকে রীতিমত চিন্তিত দেখা গেল। চিন্তার কারণ হল সিরিয়ায় প্রবেশ করবার জন্য তাবেতের কোন ভিসা নেই। লেবানন,

সিরিয়া ও জর্ডনের যাত্রীদের বেইরুট বন্দরে নামতে হবে। এখন কি করা যায়!

তাবেতের কর্তারা নিষেধ করেছিল। আরজেনটিনার সিবিয় দূতাবাসে তাবেত যেন ভিসার জন্য আবেদন না করে, কারণ কোথায় কোন্ অতি উৎসাহী কেরানি কি বাগড়া দেবে কে জানে? তাবেত তাই ভিসার জন্যে আবেদন করেনি।

তাবেতকে চিন্তিত দেখে শেখ আবদ কারণটা জিজ্ঞাসা করল। তাবেত স্বীকার করল সিরিয়ায় প্রবেশ করার জন্যে তার ভিসা নেই। সাংঘাতিক একটা ভুল হয়ে গেছে। তাড়াতাড়িতে সে তার আবজেন-টিনার পাসপোর্টের ওপর ভিসার ছাপ মারিয়ে নেয়নি। এখন তাকে বেইরুটে নামতে দেবে তো?

এই ব্যাপাব? এই তোমাব সমস্যা? শেখ আরদ তো হেসেই অস্থির। এখন জাহাজ থেকে নেমে আমাব সঙ্গে চল তো। এখানে বেইরুটে কেউ তোমাব ভিসা চাইবে না। বন্দরেব বাইরে শেখেব বিরাট গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। শেখ তাবেতকে নিয়ে গাড়িতে উঠল এবং সিরিয়ার সীমান্তে তাবেতকে নিয়ে শেখ কাস্টম্‌স অফিসে ঢুকল। তাবপর দামাস্কাসেব কোন বড় কর্তাকে টেলিফোন কবল। সীমান্ত-বক্ষী পুলিসকে বড় কর্তা বলে দিলেন কামাল তাবেতকে যেন আটকানো না হয়। সমস্যা মিটে গেল।

দামাস্কাসের বিলাসবহুল হোটেল সেমিমারিস হোটেলে উঠল এলি কোহেন। শত্রুরাজ্যে প্রবেশ করে গুপ্তচর কামাল তাবেত এই প্রথম অনুভব করল যে তাকে এবার থেকে খুব সাবধানে পা ফেলতে হবে। বেফাঁস কিছু বলা বা করা চলবে না।

শেখ মজিদ অল আরদ এবং বুয়েনস এয়ারস থেকে কামাল তাবেত যে সব পরিচয়পত্র এনেছিল তার মাধ্যমে সে অচিরেই সিরিয়ার হাই সোসাইটিতে প্রবেশ করল। হোটেলেই সে থাকে। আরজেনটিনাব ব্যাঙ্ক থেকে টাকা আসে, সে টাকা পাঠায় শিনবেত।

শিনবেত-এরও টাকার অভাব নেই। সারা পৃথিবীর ধনী ইহুদিরা ইজেরেলকে টাকা দিয়ে আসছে।

সিরিয় সোসাইটিতে তাবেত জনপ্রিয় হয়ে উঠল। সে জোর গলায় বলত ইহুদিদের ষড়যন্ত্রই হল সব গোলমালের মূল অতএব ইজরেলকে মানচিত্র থেকে মুছে ফেলতে হবে আর সিরিয়ার সামরিক শক্তি বাড়িয়ে তুলতে হবে—প্রায় প্রতি পার্টিতে এই তিনটি বিষয় নিয়ে তাবেত আলোচনা করত।

তার পার্টিতে আসত সিরিয়ার সরকারী কর্মচারী, রাজনীতিক, সাংবাদিক আর সামরিক অফিসারেরা। ছোটখাটো কেউ নয়, সকলেই জাঁদরেল। বিশেষভাবে নাম করতে হয় দু'জনের, প্যারাশুট বাহিনীর কর্ণেল হাতুম এবং কর্ণেল ডালি, দুজনেই বয়স্ক, মিলিটারিতে বেশিদিন থাকবার ইচ্ছে নেই, শিগগির রাজনীতিতে নামবেন।

তাবেত এখানেও তার আমদানী রপ্তানির ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু বন্ধুদের অবাক করে এক দিন সে ঘোষণা করল যে এখানে তার স্বাস্থ্য ভাল থাকছে না। এদেশের মানুষ হলেও দীর্ঘদিন সে দেশছাড়া, জলহাওয়াটা এখনও তার ঠিক রপ্ত হয় নি। তাই সে মনে করছে কিছুদিন আরজেনটিনা ঘুরে আসবে।

আরে আরে তাও কি হয় নাকি! থাকতে থাকতেই জল হাওয়া সহ্য হয়ে যাবে। দামাস্কাসে যাতে তাবেতের মন বসে এই জন্য তার এক বন্ধু তাকে সরকার পরিচালিত রেডিও টি ভি কেন্দ্রে একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিল। স্পেন ও ল্যাটিন আমেরিকার জন্য অনুষ্ঠান সূচীর প্রধান করে দেওয়া হল তাবেতকে। তাবেত আপাততঃ সিরিয়াতেই রয়ে গেল।

শহরের অভিজাত পল্লী আবুরেমানি অঞ্চলে বেশ বড় একটা বাড়ি ভাড়া করে তাবেত উঠে এল। ফুলের বাগান ঘেরা বাড়িখানা দামী ফার্নিচার, কার্পেট ও পর্দা দিয়ে উত্তমরূপে সাজানো হল।

প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই বাড়িতে আলো ঝলমল করে, বাড়ির সামনে সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে—রিসেপশন, পার্টি, ডিনার, নাচ ও মদিরনয়না সুন্দরীদের ভিড় লেগেই আছে সেখানে।

এইবার আসল কাজ আরম্ভ করল কামাল তাবেত। একটি গোপন কক্ষকে সে ফটোগ্রাফিক ডার্করুমে পরিণত করল। এনলার্জারের সাহায্যে ছোট ছবিকে যেমন বড় করা যায় তেমনি আর এক যন্ত্রেব সাহায্যে বড় ছবিকে খুব ছোট করা যায়, এত ছোট যে সেগুলি কোন ছাপা কাগজে বসিয়ে দিলে ফুলস্টপ বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। এগুলিকে বলা হয় মাইক্রো ডট। পরে অন্য এক যন্ত্রের সাহায্যে এই ডটগুলিকে আবার বড় করে পাঠোদ্ধার করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেব সময় জার্মানরা এটি আবিষ্কার করেছিল।

কামাল তাবেত তার বার্তা মাইক্রোডটে রূপান্তরিত করে খেলার তাসের কোথাও না কোথাও লাগিয়ে দিত। তারপর উপহার স্বরূপ সেই তাস পাঠাত আরজেনটিনায় কোন বন্ধুব কাছে। বন্ধুর কাছ থেকে সেগুলি চলে যেত ইজরেলে। শিনবেত সেগুলির পাঠোদ্ধার করত। তাবেত পাঠাত একেবারে ঘোড়ার মুখের খবর।

এ ছাড়া স্পেন ও ল্যাটিন আমেরিকার উদ্দেশ্যে সে যে সব অনুষ্ঠান প্রচার করত তারই মধ্যে শিনবেত উদ্ভাবিত সাঙ্কেতিক ভাষায় কিছু কিছু খবরও ঢুকিয়ে দিত। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অনেক খবরই কামাল তাবেত এইভাবে রেডিও ব্রডকাস্ট মারফত পাঠাতে আরম্ভ করল।

ইতিমধ্যে গোলান হাইটে দুর্গ নির্মাণ শেষ হয়ে গেছে। সিরিয়ার একটা আত্মবিশ্বাস এসেছে এই দুর্গ তাদের সামরিক শক্তির প্রতীক। দুর্ভেদ্য এই দুর্গ। ইজরেলের সাধ্য নেই এই দুর্গ অতিক্রম করে সিরিয়ায় প্রবেশ করে।

টেল আভিভ এবার চোরাপথে ছোট অথচ দারুণ শক্তিশালী

একটি বার্তা গ্রাহক প্রেরক রেডিও পাঠাল তাবেতকে। এখন আর মাইক্রো ডট পাঠাবার দরকার নেই, স্প্যানিশ অনুষ্ঠানেও গোপন বার্তা প্রচার করবার দরকার নেই। এখন থেকে তাবেতের বাংলো থেকে সরাসরি রেডিও মারফত বার্তা আদান প্রদান চলবে।

একদিনের কিছু গোপনীয় সংবাদ সাঙ্কেতিক ভাষায় রূপান্তরিত করে গভীর রাত্রে সারা দামাস্কাস যখন ঘুমিয়ে আছে, নির্দিষ্ট সময়ে সে ইজরেলে 'দরবেশ'কে ডাকল। এই রকম ব্যবস্থাই ছিল। এই ভাবেই তাবেত মিলিটারি সিক্রেট পাঠাতে আরম্ভ করল।

'দরবেশ' তার বার্তা গ্রহণ করে সেইদিনই পাল্টা একটি নির্দেশ দিল: সিরিয়াতে সোভিয়েট রাশিয়ার সমর্থক উগ্র বামপন্থী বাথ পার্টির প্রতি কামাল তাবেত যেন তার সহানুভূতি দেখায়। কারণ অনুমান করা হচ্ছে যে শীঘ্রই সিরিয়া সরকারের পরিবর্তন হবে। পাকা খবর পেয়েছে শিন বেত।

হেড কোয়াটারের আদেশ। পরদিন থেকেই তাবেত সেই উগ্র বামপন্থীদের সমর্থনে কথা বলতে আরম্ভ করল এবং সেই সপ্তাহের মধ্যেই সে বাথ পার্টির সভ্য হয়ে গেল। এক মাসের মধ্যেই ক্যু দ্য তাত। সিরিয়ার সরকার উল্টে গেল। বাথ পার্টি ক্ষমতায় এসে গেল। নতুন প্রেসিডেন্ট হলেন সেই জেনারেল আমিন অল হাফেজ, আরজেনটিনায় সিরিয়া দূতাবাসে যিনি কামাল তাবেতের বন্ধু ছিলেন। এতদিন তাকে সিরিয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল।

কামাল তাবেত বাথ পার্টির মধ্যে তখন এতই জনপ্রিয় যে নতুন সরকারে সে হয়তো একজন মন্ত্রী হয়ে যেত কিন্তু সে যে আরজেনটিনার নাগরিক!

এদিকে তার পুরনো তিন বন্ধুর সঙ্গে সখ্যতা অটুট রয়েছে। কর্নেল ডালি, কর্নেল হাতুম এবং সেই শেখ অল আরদ। দুই কর্নেল তাকে অনেক খবরই দিয়ে যাচ্ছে। কারণ তাবেতের ওপর তাদের বিশ্বাস অটুট।

নারীর প্রতি রীতিমত দুর্বলতা ছিল এই দুই কর্নেলের। তাবেত এই শহরে আসবার আগে তাদের অভিলাষ পূর্ণ করবার জন্যে অনেক অসুবিধে হত। অর্থব্যয় করতে হত প্রচুর। কিন্তু এখন তাদের জন্যে তাবেতের বাড়ির দ্বার সর্বদাই খোলা। সেই বাড়িতে মজুত আছে সুন্দরী নারী আর দুষ্প্রাপ্য সুরা। কেবল তার নিজের শোবার ঘরে তাদের প্রবেশ নিষেধ ছিল। এই ঘরেই ছিল সেই শক্তিশালী ট্রান্স-মিটার। নারী উপভোগ করে আর সুরা পান করে দুই কর্নেল অনেক কথাই বলে ফেলত। তাদের সেই আলগা কথা যে ইজরেলে পৌঁছে যাচ্ছে তা তাদের মাথায় আসত না।

তিনজনের মধ্যে ধূর্ত ছিল শেখ। শহরের সকল লোককেই সে চিনত। খবর রাখত নানা বিষয়ে, কিন্তু বিনা পয়সায় বা বিনা স্বার্থে শেখ কিছুই বলত না।

১৯৬৪ সাল এল। তাবেতের বাড়িতে সেই রকম ভাবেই পার্টি, ডিনার ও রিসেপশন চলছে। কিন্তু এগুলি ছাড়া মাঝে মাঝে বেশি রাত্রে তাবেত বিশেষ কয়েকজন ব্যক্তির জন্যে স্পেশাল পার্টির ব্যবস্থা করত। এই সব পার্টিতে দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান সুরা ও নানারকম মুখরোচক খাবারের সম্ভার টেবিলের ওপর সাজিয়ে দেওয়া হত। বেলি ড্যান্সার অবশ্যই থাকত আর উপস্থিত থাকত অভিজাত পরিবারের কিছু সুন্দরী মহিলা, যারা নিজেদের স্বামীকে নিয়ে তৃপ্ত নয়।

যে সকল বিশেষ ব্যক্তিরা আসত তারা পার্টির রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করত। শ্রোতা ছিল তাবেত। মাঝে মাঝে সে মন্তব্য করত, অভিযোগ করত। ওরা তাবেতের অভিযোগ খণ্ডন করতে গিয়ে অনেক গোপন খবর বলে ফেলত।

তাবেতের অভিযোগের মূল সুর ছিল যে সিরিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী নয়। গোলান হাইটস-এর দুর্গ নিয়ে তোমাদের এত যে গর্ব তা এতই দুর্বল যে আমার তো মনে হয় ইজরেল চব্বিশ

ঘণ্টার মধ্যে গোলানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার করে দেবে। ফ্রান্সের ম্যাজিনো লাইনের মতই তোমাদের এই দুর্গ ব্যর্থ হবে।

এই ধরনের কথা বলার কারণ ছিল। এই দুর্গ সম্বন্ধে টেল আভিভ প্রচুর খবর পেয়েছে তাবেতের কাছ থেকে, এখন তারা চায় গোলান দুর্গের নকশা। শিনবেত তাবেতকে তাগাদা দিচ্ছে। তাবেতের অভি-যোগ প্রেসিডেন্ট আল হাফেজের কানে উঠল। তিনি ভাবলেন যে তাবেত যদি এই ভাবে বলে বেড়ায় তাহলে তা হয়তো অনেকের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি করতে পারে। স্থির হল যে তাবেতকে প্রথমে সীমান্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তারপর গোলান দুর্গ দেখান হবে। কারণ তাবেতের মন থেকে ভুল ধারণা দূর করা উচিত।

প্রেসিডেন্ট আল হাফেজ স্বয়ং কামাল তাবেতের জন্যে সীমান্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করে দিলেন। পুরো দুই দিন ও দুই রাত্রি ধরে সামরিক বিভাগের অফিসারদের সঙ্গে তাবেত সীমান্ত ও গোলান দুর্গ ঘুরে ঘুরে দেখল। তারপর ইচ্ছে করে সে রাত্রিতে গোলান দুর্গ থেকে ইজরেলের হুলে ভ্যালি দেখল।

দুর্গ থেকে নীচে হুলে ভ্যালি দেখতে দেখতে তাবেত অফিসারকে প্রশ্ন করল: আচ্ছা, ইহুদি কুকুরেরা যদি এই দিক থেকে আমাদের দুর্গ আক্রমণ করে তাহলে তাদের আটকাবে কি করে?

সিরিয় মিলিটারি অফিসার মৃদু হেসে বলল: কেন, এই রিকয়েললেস কামান, ঐ হেভি আর্টিলারি আর ঐ খাঁজের আড়ালে রকেট ফায়ারিং ক্যাটুশা আপনার চোখে পড়েনি? চোখে না পড়বারই কথা, কারণ ওগুলি ক্যামুফ্লাজ করে রাখা ছিল।

তাবেত ইচ্ছে করে বোকার মত প্রশ্ন করতে লাগল আর মিলিটারি অফিসারেরা হাসতে হাসতে তার অজ্ঞতা উপভোগ করতে করতে সব প্রশ্নের জবাব দিতে লাগল। এমন কি গোলান দুর্গের ম্যাপ বার করে অনেক কিছু দেখিয়েও দিল। হ্যাঁ, এবার তাবেত সব বুঝেছে। সে এখন সন্তুষ্ট। তার ভুল ধারণা দূর হয়েছে।

যা দেখেছে, যা শুনেছে, যা বুঝেছে, তাবেত তার ছক করে নিল। পবদিন দামাস্কাসে ফিবে তাবেত স্বীকাব করল যে সে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেখে বুঝতে পেবেছে যে তার ধাবণা এতদিন ভুল ছিল, সে এখন সন্তুষ্ট। এবং এতদূব সন্তুষ্ট যে সিরিয়ান আর্মিব নামে কামাল তাবেত পঁয়ত্রিশ হাজাব ডলাবেব একখানা চেক কেটে দিল।

সেদিন বাত্রে তাবেত দরবেশকে কোন খবব পাঠাল না। পবদিন বাত্রেও নয়। টেল আভিভ চিন্তিত। এইসব খবর বেডিও মাবফত পাঠানো বিপজ্জনক।

ওদিকে ব্যবসা সংক্রান্ত কাজের জন্যে কামাল তাবেত দামাস্কাস ত্যাগ কবল, শীগগিবই ফিবে আসবে। কোথায় যাচ্ছে কাউকে জানিয়ে গেল না।

তাবেত গেল দামাস্কাস থেকে জুবিথ সেখান থেকে টেল আভিভ। সেখানে থেকে গোলান দুর্গেব নকশা ও সিবিয়াব প্রতিবক্ষাব ব্যবস্থা ও অন্যান্য বিববণ শিন বেত হেড কোয়ার্টাবে জানিয়ে দিল।

দারুণ কাজ কবেছে এলি কোহেন। শিনবেত তথা ইজবেলেব সামবিক বিভাগ এলি কোহেনকে সিবিয়াতে পাঠিয়ে পর্যন্ত যে ম্যাপেব জন্য এতদিন ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা কবছিল আজ সেই ম্যাপ এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যক তথ্য তাদের হস্তগত।

শিনবেত হেড-কোয়ার্টাবে কাজ সেরে এলি কোহেন তাব বৌ ও বাচ্চাদের সঙ্গে দেখা কবে আবার দামাস্কাসে ফিরে গেল। এতদিন কোথায় ছিল বা কোথায় যাচ্ছে সে সব কথা এলি কোহেন নাদিয়াদ-কে বলতে পাবল না।

কার্যসিদ্ধি হয়েছে। এলি কোহেন তো সিরিয়াতে না ফিরলেই পারত! কিন্তু সে যদি না ফিরত তাহলে গোলান দুর্গ ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেখার পরই তার হঠাৎ অদৃশ্য হওয়া সিরিয়া সরকারের মনে সন্দেহ উদ্রেক করত। তাবা তখনই নিশ্চিত ধরে নিত যে কামাল তাবেত একজন গুপ্তচর। সিরিয়ার সামরিক বিভাগ তখনই তাদের

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বদলে ফেলত। এই অনুমানের ভিত্তিতেই এলি কোহেনকে সিরিয়াতে ফেরত পাঠান হল।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে কামাল তাবেত ধরা পড়বার পরও সিরিয়ার সামরিক বিভাগ তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কিছু রদবদল করেনি। গোলান দুর্গের নকশা যে পাচার হয়ে যেতে পারে এটা হয়তো তারা বুঝতে পারেনি।

দামাস্কাসে রাজনীতিক ও অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রথম সারিতে কামাল তাবেত তার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ও বাঘা জেনারেলরা তার বন্ধু। এদের সকলকেই তাবেত হাত করেছে। তাবেতের মনে একটা গভীর আত্মবিশ্বাস এসেছিল, সে সন্দেহের অতীত। তবুও সে ধরা পড়ে গেল একে বারে হাতে-নাতে।

ইজরেলের মারাত্মক ভুল হয়েছিল কামাল তাবেতকে ট্রান্সমিটার দেওয়া। তাবেত স্বয়ং বার্তা প্রেরণ করত। এটাও একটা ভুল। উচিত ছিল তাবেত বার্তা সংগ্রহ করে তা সাংকেতিক ভাষায় পরিণত করে রেডিও অপারেটরকে দেবে। রেডিও অপারেটর অন্য কোন স্থান থেকে সেই বার্তা পাঠাবে। কিন্তু এখানে তা হয়নি। তাবেত নিজের বাড়ি থেকে নিজেই বার্তা পাঠাত। পৃথক স্থানে ট্রান্সমিটার ছিল না, পৃথক কোন অপারেটরও নয়। এইখানেই শিনবেত ভুল করেছিল।

১৯৬৪ সালের হেমন্ত কালে রজনীর শেষ ভাগে সিরিয়ার কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের রেডিওরুমে একটি বেতার সংকেত ধরা পড়ল। সেই বেতার সংকেত ভেসে আসছে দামাস্কাসের আকাশ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে সেই বেতার তরঙ্গের মাপ অর্থাৎ ওয়েভলেন্থ ও সময় লিখে নেওয়া হল।

পরদিন এবং তারও পরদিন সেই সংকেত আর শোনা গেল না, কিন্তু সিরিয়ার বেতারবিদ্‌দের নৈপুণ্য ও দক্ষতা কিছু কম নয়। কি করে গোপন ট্রান্সমিটারের অবস্থিতি ধরা যায় তা তারা জানত এবং

বেশ কয়েকদিন চেষ্টার পর সঠিক স্থান ধরেও ফেলল। অবাক কাণ্ড? ট্রান্সমিটারটি আছে কামাল তাবেতের বাড়িতে।

কামাল তাবেত এক রাত্রে যখন তার বেডরুমে বসে বার্তা প্রেরণ করছিল ঠিক সেই সময়ে সিরিয়ার সিকিউরিটি পুলিস তাকে গ্রেফতার করল।

অবিশ্বাস্য ও চাঞ্চল্যকর এই খবর চেপে রাখা যায় না। সিরিয়া সরকার ও তাবেতের বন্ধুরা স্তম্ভিত। তবুও সিরিয়া সরকার প্রথমে সরকারী ভাবে সংবাদ প্রকাশ করেনি। ১৯৬৫ সালের ২৪শে জানুয়ারি দামাস্কাস রেডিও নাম উল্লেখ না করে সংবাদ ঘোষণা করল। এ ডেঞ্জারাস জুইশ স্পাই হ্যাজ বিন ক্যাপচার্ড।

তাবেতকে গ্রেফতার করার পর সিকিউরিটি পুলিস গুপ্তচর সন্দেহে আরও অনেককে গ্রেফতার করল। তার মধ্যে ১৩ জনকে তো সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসি দেওয়া হল যদিও তারা স্বীকার করেছিল যে তারা উগ্র রাজনীতিক পার্টির সভ্য মাত্র, স্পাই নয়।

এলি কোহেনের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ইজরেল সরকার চেষ্টার ত্রুটি করেনি। ফ্রান্সের বিখ্যাত আইনবিদ্ জ্যাক মারসিয়ারকে তারা দামাস্কাসে পাঠিয়েছিল এবং এমন প্রস্তাবও করেছিল যে কামাল তাবেতকে মুক্তি দিলে তারা ইজরেলের জেলে বন্দী দশ জন সিরিয় গুপ্তচরকে মুক্তি দেবে।

লণ্ডনের সাণ্ডে টাইমসের খবর তো আরও চাঞ্চল্যকর। ইজরেল নাকি তাবেতের মুক্তির বিনিময়ে দু'কোটি আশি লক্ষ ডলার, প্রচুর পরিমাণে লরি, ট্রাক ও ওষুধ পত্তর দিতে চেয়েছিল কিন্তু সিরিয়া রাজি হয়নি।

গুপ্তচর ধরা পড়লে সাধারণতঃ তাকে অস্বীকার করা হয়। এক্ষেত্রে ইজরেল তার গুপ্তচরের জন্য যথেষ্ট করেছিল।

পাঁচজন নিয়ে মিলিটারি ট্রাইবুনালে তাবেতের গোপনে বিচার হয়েছিল। সেই ট্রাইবুনালের প্রধান ছিল তাবেতের পুরনো বন্ধু কর্নলে

ডালি এবং কর্নেল হাতুম ছিল ডালির পরই। তাবেতের সঙ্গে আরও ৩৭ জনের বিচার করা হয়েছিল কিন্তু তাদের নাম কখনো ঘোষণা করা হয়নি। তবে শোনা যায় ২০ জন ছিল নাকি মাঝারি দলের মিলিটারি অফিসার আর বাকি ১৭ জন কামাল তাবেতের পার্টি গার্ল।

১৯৬৫ সালের ১৮ই মে রাত্রি যখন শেষ হয়েছে বড় মসজিদের মিনার থেকে যখন আজান দেওয়া হচ্ছে ঠিক সেই সময়ে তাবেতকে দামাস্কাসের গ্রেট স্কোয়ারে নিয়ে গিয়ে ফাঁসিতে লটকে দেওয়া হল, তার দেহের ওপর একখানা সাদা কাগজ ঢাকা দেওয়া হল যার ওপর আরবি হরফে লেখা ছিল: শত্রুকে গোপন খবর দেওয়ার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

দামাস্কাসের কোন অজ্ঞাত স্থানে এলি কোহেনের কবরের মাটি ভাল করে শুকোতে না শুকোতে প্রেসিডেন্ট আলহাফিজ জেলে নিক্ষিপ্ত, কর্ণেল ডালি এবং কর্নেল হাতুম ফায়ারিং স্কোয়াডের গুলিতে নিহত হল। কিন্তু এদের অপরাধ ভিন্ন। সিরিয়ার জটিল রাজনীতির বলি।

জানা নেই গোলান দুর্গ জয় করবার পর ইজরেল সরকার সেখানে কোন ফলক বসিয়ে ছিলেন কিনা যাতে লেখা থাকা সম্ভব ছিল, কামাল তাবেত নামে একজন আরবের জন্যই এই হাইট্‌স অফ গোলান ও দুর্গ জয় করা সম্ভব হয়েছে।

সমস্ত স্বাধীন দেশে বিভিন্ন দেশের এমব্যাসি বা দূতাবাস থাকে। দূতাবাসের প্রধান হলেন রাষ্ট্রদূত বা অ্যামবাসাডর। দুই দেশের মধ্যে মৈত্রী রক্ষা করা এবং নানারকম কাজ করতে হয় অ্যামবাসাডরকে। তাঁকে সাহায্য করবার জন্য অনেক কর্মী ও দফতর আছে।

অ্যামবাসাডরের আরও একটি কাজ হল খবর সংগ্রহ করা, কিছু প্রকাশ্যে কিছু গোপনে। গোপনে খবর সংগ্রহ করার জন্যে দূতাবাসে

স্পাই থাকে তবে তাকে স্পাই বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয় না। তাকে অন্য কোনে কাজের ভার দেওয়া থাকে। সেইটে হল তার ওপরের খোলস। ভেতরে ভেতরে সে তার সংবাদ সংগ্রহ করে যায়।

সে সব দেশে খবর সংগ্রহ করা অনেক সহজ। খবরের কাগজ, রেডিও বা টিভি মারফত খবর প্রচারিত হয় তাছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রকের কাছে খবর চাইলে খবর পাওয়া যায় বা আলোচনা করা যায়।

কিন্তু যে সব দেশে খবর সংগ্রহ করা কঠিন সেই সব দেশে সোজা কথায় খবর চুরি করতে হয়। চুরি মানেই গোপনে ও সাবধানে করতে হয় অথচ তাকে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াতে হবে। কেউ যেন না সন্দেহ করতে পারে যে সে একজন বিদেশী গুপ্তচর।

একজন অসাধারণ গুপ্তচরের নাম হল ডক্টর রিচার্ড সর্জ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যে সব বাঘা বাঘা গুপ্তচরের নাম শোনা যায় তাদের মধ্যে সর্জ ছিল সবচেয়ে চৌকস এবং সেরা।

সর্জ ছিল জার্মান কিন্তু সে রাশিয়ার হয়ে কাজ করত।

আরও একজন দারুণ স্পাইয়ের নাম শোনা যায়, সে হল কর্ণেল রুডলফ এবেল। রাশিয়ার স্পাই, অ্যামেরিকায় কাজ করত। তবে সে হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। সি আই এ-এর ডালেস নাকি বলেছিল যে আমি যদি এবেলের মতো স্পাই পেতুম তাহলে আমার চরচক্রের চেহারাই পালটে যেত।

একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। রাশিয়ার যারা অসাধারণ স্পাই তাদের মধ্যে এবেল ছাড়া সকলেই প্রায় বিদেশী, কেউ জার্মান, কেউ ব্রিটিশ, কেউ বা অন্য দেশের। এদের মধ্যে সর্জ ব্যতীত নাম করা যায় গর্ডন লনসডেল, অ্যালেকজাণ্ডার ফুট, রুডলফ রসলার ('লুসি') এবং কার্ল ফুকস-এর।

আপাততঃ রিচার্ড সর্জের কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী শুনুন।

রিচার্ড সর্জের জন্ম জার্মানিতে ১৮৯৫ সালে। তার বাবা ছিলেন

অয়েলড্রিলার অর্থাৎ পেট্রলের কূপ খোঁড়া ছিল কাজ। রাশিয়ার বাকু অয়েল ফিল্ডে বেতন ভাল, সেই জন্যে রিচার্ডের বাবা বাকু চলে গিয়েছিল, পরে আবার ফিরে আসে। রিচার্ড তখন শিশু।

যখন ফিরে এল তখন রিচার্ড বেশ বড় হয়েছে, স্কুল যাবার বয়স হয়েছে। তাকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল। মেধাবী ছাত্র হিসেবে তার সুনাম হল।

প্রথম মহাযুদ্ধে রিচার্ড সর্জ কাইজারের সৈন্যদলে ভর্তি হল। যুদ্ধক্ষেত্রে তার পা জখম হল। চিকিৎসার জন্যে ফ্রন্ট থেকে তাকে ফেরৎ পাঠান হল। ১৯১৬ সালে রিচার্ড ফ্রন্টে ফিরে গিয়ে সঙ্গীদের অন্যরকম চেহারা দেখল। তার সঙ্গীরা যে সাহস ও উদ্দীপনা নিয়ে লড়াই করতে গিয়েছিল এখন সেই সাহস ও উদ্দীপনা তিরোহিত। তার স্থানে হতাশা ও ত্রাশ তাদের বুকের ওপর চেপে বসেছে।

রিচাডকে আবার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসতে হলো, ভয়ে নয়, আবার সে আহত হয়েছে। এবার আঘাত গুরুতর।

সর্জের ঠাকুরদা অ্যাডলফ সর্জ কিছুদিন স্বনামধন্য কার্ল মার্কসের প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। সেই সুবাদে বাড়িতে মার্কসের ডাস ক্যাপিট্যাল বইখানি সমেত আরও কিছু বই ছিল।

আহত সর্জ সময় কাটাবার জন্যে মার্কস সাহিত্যে মনোনিবেশ করল কিন্তু 'ক্যাপিটাল' তাকে দারুণ ভাবে আকৃষ্ট করল! সে এক নতুন জগতের সন্ধান পেল।

আর্মিতে যোগ দেবার আগে সর্জ পলিটিক্যাল ইকনমি এবং হিস্টরির ছাত্র ছিল। যুদ্ধের শেষে আর্মি থেকে ছাড়া পেয়ে সর্জ প্রথমে কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হল এবং পরে হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২০ সালে গ্র্যাজুয়েট হল। লেখাপড়ায় সে খুব ভাল ছিল। অচিরেই সে পলিটিক্যাল সায়েন্সে ডক্টরেট অর্জন করল। ডক্টরেট পেয়ে সর্জ জার্মান কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য হল।

হামবুর্গের একটা স্কুলে সর্জ শিক্ষকতার চাকরী নিল কিন্তু চাকরি

বেশিদিন রাখতে পারল না। হেডমাষ্টার টের পেল যে তার ওই নবীন শিক্ষকটি তার ছাত্রছাত্রীদের কমিউনিজমের পাঠ দিচ্ছে এবং পার্টির জন্যে সভ্যও সংগ্রহ করছে।

যুদ্ধের পরে জার্মানিতে চাকরি পাওয়া কঠিন। ঘুরতে ঘুরতে কয়লাখনিতে চাকরি পেল। ওদেশে শ্রমের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত। একজন ডক্টরেটের খনি থেকে কয়লা তুলতে লজ্জা নেই।

সর্জ এখানেও শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিজম প্রচাব করতে লাগল। শ্রমিকদের বোঝালো মালিকেরা তাদের নামমাত্র মজুরি দিয়ে প্রচুর মুনাফা লুটছে। ফলে উৎপাদন হ্রাস পেল এবং মালিক তাকে বরখাস্ত করল।

সর্জ যখন কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত সেই সময় কিয়েল বন্দরে একটা বিরাট আন্দোলন হয়েছিল যার ফলে জার্মান নেভি বিদ্রোহ করে। এই আন্দোলনে সর্জ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল।

সেই আন্দোলনে সর্জের অংশ গ্রহণ এবং তার পরবর্তী কার্যকলাপ কমিউনিষ্ট নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সর্জের মধ্যে তারা সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছিল এবং তার বিষয় বিশেষভাবে বিচার করেছিল। কয়লাখনির চাকরি থেকে বিদায় নিয়ে সে তার বাসায় ফিরে দেখল তার জন্যে অপেক্ষা করছে হেনরি টলম্যান, হামবুর্গে কমিউনিষ্ট সিকিউরিটির সিক্রেট চিফ।

কি ব্যাপার? সর্জ প্রশ্ন করে—

টলম্যান প্রস্তাব করে, তোমাকে মসকো যেতে হবে, তোমাকে আরও ট্রেনিং নিতে হবে। অতএব তিন সপ্তাহ পরে সে মসকো পৌঁছল। সর্জের অনেক গুণ ছিল কিন্তু তার একটি মাত্র দুর্বলতা ছিল সে দুর্বলতা হল নারীর প্রতি। প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের এই দুর্বলতা বোধহয় প্রেরণার কাজ করে। বহু প্রতিভাশালী ব্যক্তির এই দুর্বলতা দেখা যায়।

মসকো যাবার আগে একটি মেয়ের সঙ্গে সর্জের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

মার্কস এবং কমিউনিজমের প্রতি তার আকর্ষণ, সর্জ সেই মেয়েটির কাছে প্রকাশ করেছিল। মেয়েটি একজন পুলিস এজেন্ট ছিল। তার কাছ থেকে এই তথ্য জার্মান পুলিস এবং পরে ব্রিটিশ পুলিস জেনে থাকতে পারে।

মসকোয় পৌঁছবাব পবদিন কমিনটার্নেব ফরেন ইনটেলিজেন্স ডিভিসনেব প্রধান ডিমিট্রি ম্যানুইলিসকির সঙ্গে সর্জের দেখা হল। সর্জ যে মসকোয় আসছে এ খবর পার্টিব কাছে পৌঁছেছিল কিন্তু তার জন্যে কি ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে তা সর্জের জানা ছিল না।

সর্জ ভেবেছিল যে তাকে হয় তো কমিউনিজমেব উচ্চতর পর্যায়ের পাঠ নিতে হবে কিন্তু না। ম্যানুইলিসকি বলল, তোমাকে স্পাই হতে হবে। তাতে যদি পার্টিব কল্যাণ হয় তো সর্জ রাজি। মাটি খুঁড়তে বললেও সে পার্টির জন্য মাটিও খুঁড়বে।

স্পাই-এর বিভিন্ন বিভাগ ও সর্বাধুনিক কলাকৌশল ও প্রযুক্তি বিদ্যা সম্বন্ধে সর্জকে হাতে কলমে ট্রেনিং দেওয়া হল। এত উত্তমরূপে ট্রেনিং খুব কম স্পাইকেই দেওয়া হয়েছে। ছাত্রও খুব ভাল, একের পর এক স্পাই স্কুলে সে প্রচুব সুনাম অর্জন করল। পাঁচ বছর ধরে তাকে ট্রেনিং দেওয়া হল।

এই সময়েব মধ্যে সে রাশিয়ান ভাষা উত্তমরূপে শিখে নিল। রাশিয়ানদের মতোই সে অনর্গল রুশ ভাষায় কথা বলতে পারত। ইংরেজি এবং ফরাসি ভাষাও শিখলো। দু'ভাষাতেই না থেমে কথা বলতে পারত।

এই পাঁচ বছরের মধ্যেই অভিজ্ঞ স্পাইয়ের অধীনে কাজ করবার জন্যে তাকে প্রথমে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া এবং পরে বলকানে পাঠান হল।

এরপর একলা কাজ করবার জন্যে তাকে পাঠান হল আমেরিকায় লস এঞ্জেলস শহরে। তাকে ভার দেওয়া হল অ্যামেরিকান ফিলম ইণ্ডাস্ট্রি সম্পর্কে অলিগলি অনুসন্ধান করে পুরো রিপোর্ট করতে।

মসকোয় তাঁর কর্তারা যা আশা করেছিল তার চেয়ে উত্তম রিপোর্ট দিল সর্জ।

মসকোয় ফিরে আসবার পর সর্জকে ভাল করে বাজিয়ে নেওয়া হল। দেখা গেল যে এই লোকের ওপর নির্ভর করা চলে। ১৯২৮ সালে সর্জকে পাঠান হল ইংলণ্ডে। ইংলণ্ডে এসে সে লণ্ডনে ব্লুমসবেরিতে একটি বোর্ডিং হাউসে একখানা ঘর ভাড়া নিল।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, বলকান বা ক্যালিফোরনিয়াতে সর্জকে কিয়েল এবং হামবুর্গে বাস করবার সময়ে আন্দোলন বা তাতে সে যে অংশ গ্রহণ করেছিল, এ বিষয়ে তাকে কেউ প্রশ্ন করে নি। প্রশ্ন করবেই বা কি করে। কারণ কেউ তার ছাত্র জীবন সম্বন্ধে কিছু জানত না। সেও কাউকে কিছু বলেনি।

কিন্তু ইংলণ্ডে সে ঠকে গেল। লণ্ডনে বাসা নেবার পরদিনই স্পেশাল ব্রাঞ্চের দু'জন অফিসার এসে হাজির। রিচার্ড সর্জ তো বিদেশী। লণ্ডনে পৌঁছে এ কথা পুলিসকে জানানো উচিত ছিল। পুলিস নাম রেজেস্টারি করে রাখবে। সর্জ তা করাতে ভুলে গিয়েছিল। ইংলণ্ডে আগমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে করতে এস বি-এর লোক সহসা জিজ্ঞাসা করল যে সর্জ কখনও হামবুর্গে বাস করেছিল কিনা। জিজ্ঞাসা করে তারা তার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

সর্জ অস্বীকার করল কিন্তু মনে হল তার কথা এস বি-এর লোকেরা বিশ্বাস করেনি।

সর্জ কিন্তু মনে মনে ইংরেজ এস বি-কে তারিফ করল। সে মসকোতে রিপোর্ট করল: অন্য দেশ অপেক্ষা ইংলণ্ড বিদেশী স্পাইদের সম্বন্ধে অনেক খোঁজখবর রাখে। ইংলণ্ডে সে বেশি দিন রইল না।

পর বৎসর সর্জকে কমিনটার্ণ থেকে ফরেন অ্যাফেয়ারস বিভাগের সেক্রেটারিয়েটে বদলি করা হল। তাকে আরও বড় কাজ

করতে হবে, যার ক্ষেত্র আরও ব্যাপক। বিভাগের নাম যাই হোক আসলে তাকে বদলি করা হল মিলিটারি ইনটেলিজেন্সের জি আর ইউ দফতরে।

মসকোর গুপ্তচর বিভাগে বড় বড কর্তাদের কাছে সর্জের নাম ও প্রশংসা দুই-ই পৌঁছেছিল। সেণ্টারের ডিরেকটর তার সঙ্গে মাত্র কয়েকটা কথা বলেই বুঝলেন যে এর আর কিছু শেখবার বাকি নেই। এখন সেই হয় তো কর্তাদেব শেখাতে পারে।

রিচার্ড সর্জকে পাঠান হল ফার ইষ্টে, দূর প্রাচ্যে, সাংহাই হবে তাব হেড কোয়ার্টাব। তার ওপব কর্তাদের এতদূব আস্থা জন্মেছিল যে তাকে ব্ল্যাংক চেক দেওয়া হল। সর্জ যে রকম সংগঠন করুক না কেন কর্তাবা তা মেনে নেবে।

সর্জেব ওপব ভাব দেওয়া হল চিয়াং-কাই-সেক এবং তার ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদী সৈন্যবাহিনীব বিষয় যতদূর সম্ভব সংবাদ সববরাহ করা। এটি হবে তাব মূল কাজ। এ ছাড়া সে তার বিচার বিবেচনা মতো অন্য খবর পাঠাবে।

দূব প্রাচ্যে সর্জই প্রথম সোভিয়েট এজেণ্ট নয়। তার আগেও তিন বছব ধবে একটা গুপ্তচর চক্র কাজ করছিল কিন্তু তারা গুরুত্বপূর্ণ খবব সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছিল এখন দূর প্রাচ্যের গুরুত্ব বাড়ছে। এশিয়ার এই ভূখণ্ডে বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া দরকাব। চীনের উত্তর পর্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়ার এলাকা বিস্তৃত। সংগঠনের সমস্ত ভার এবং লোক নির্বাচনেরও ভার সর্জের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। সর্জ আগেকার সংগঠনের কয়েক জনকে বহাল রেখে বাকি সকলকে বাতিল করে দিল এবং সেণ্টার কর্তৃক মনোনীত দুজন রেডিও অপারেটরকে সঙ্গে নিয়ে চলল।

১৯৩০ সাল নাগাদ তার পরিচালনায় চায়না ইউনিট স্যাংহাইতে বেশ পাকাপোক্তভাবে বসল। এতদিন সে বাইরে যেখানেই গেছে

সে নিজের নাম ব্যবহার করেছে কিন্তু এই প্রথম সে নিজের নাম বলল উইলিয়ম জনসন, অ্যামেরিকান সাংবাদিক।

স্যাংহাইয়ে তার সঙ্গে অ্যামেরিকান কমিউনিষ্ট লেখিকা অ্যাগনেস স্মেজলির সঙ্গে পরিচয় হল এবং তার সঙ্গে এতদূর ঘনিষ্ঠতা হল যে সেই মহিলা তার ফ্ল্যাটে রেডিও ট্রান্সমিটার বসাতে দিতে রাজি হলেন। স্যাংহাইয়ের কিছু স্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গেও মহিলা সর্জের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ওরা কেউ কমিনিষ্ট নয় কিন্তু এরা সর্জকে সাহায্য করত। ওদের মধ্যে বিশেষভাবে নাম করতে হয় জাপানী স্কলার এবং সাংবাদিক ওজাকি হোজুমির। ওজাকি স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান এবং টোকিয়ো ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট। মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিন সে উত্তম রূপে পড়েছে। কমিউনিজমের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হলেও কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য হয় নি বা নিজেকে কমিউনিষ্ট বলে প্রচারও করত না। সাংহাইতে ওজাকি ছিল টোকিয়োর একটি সংবাদ পত্রের বিশেষ প্রতিনিধি এবং অ্যাগনেস স্মেজলির বন্ধু।

রিচার্ড সর্জ সুপুরুষ ছিল না ঠিকই কিন্তু তার অমায়িক ব্যবহার সকলকে আকৃষ্ট করত। মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলে তার প্রতিদান পাওয়া যাবে। এই নীতিতে সে বিশ্বাসী ছিল। বিনয়ী এবং মধুর ব্যবহারের জন্যে সে দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করল।

ওজাকির সঙ্গে আলাপ করে সর্জ বুঝল এই লোকটিকে তার দরকার। সে ওজাকিকে তার চক্রভুক্ত করে নিল। ওজাকি ছিল প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত এবং গোপন সংবাদ সংগ্রহে সে সর্জ অপেক্ষা পিছিয়ে ছিল না। সংবাদ বিশ্লেষণে এবং মূল খবর বেছে নেবার তার ক্ষমতা ছিল অদ্ভুত।

স্যাংহাই অফিস সুগঠিত হবার পর সর্জ চায়নার অন্যান্য কেন্দ্রগুলি তদারক করতে গেল। সাংবাদিকদের অনেক সুবিধা। তারা যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে, সকলের সঙ্গে দেখা করতে পারে এবং প্রশ্নও করতে পারে।

মাঞ্চুরিয়ার হারবিন শহরে এসে একজন জার্মান ব্যবসায়ী ম্যাক্স ক্লাউসেনের সঙ্গে তার পরিচয় হল। ক্লাউসেন আসলে সেণ্টার কর্তৃক নিযুক্ত স্পাই, একজন সুদক্ষ রেডিও অপারেটর। যদিও হারবিনে সে একজন ব্যবসায়ীরূপে পরিচিত।

ক্লাউসেন ব্যতীত হারবিনে তার সঙ্গে পরিচয় হল ওখানকার মার্কিন ভাইস-কনসালের সঙ্গে। অসুবিধে নেই কারণ সে তো এখন উইলিয়ম জনসন এবং মার্কিন সাংবাদিক। তার মধুর ব্যবহারে মার্কিন ভাইস-কনসাল অভিভূত।

যে বাড়িতে ভাইস-কনসাল থাকত সেই বাড়িতে সর্জ তার এক জার্মান বন্ধুর জন্যে দুখানা ঘর ভাড়া চাইল। ভাইস-কনসাল সঙ্গে সঙ্গে রাজি। ক্লাউসেন এই বাড়িতে উঠে এল এবং রেডিও ট্রান্সমিটারে অ্যামেরিকানদের নাকের ডগা দিয়ে মসকোতে খবর পাঠাতে লাগল।

দু'বছরের মধ্যে সর্জ ন্যানকিং, হ্যাংকাও, ক্যাণ্টন এবং পিকিং-এ কেন্দ্র খুলল এবং সাইবেরিয়া সীমান্ত থেকে মালয় পর্যন্ত তার এজেণ্টরা কাজ করতে লাগল। জার তাল সে অত দূর ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল।

সেণ্টার মসকোতে একটা আলাদা ফার ইস্টার্ন সেল খুলল। এই সেলের ভার দেওয়া হল জেনারেল বেলডিনকে। ডিরেকটরের পদে বসে বেলডিন প্রথমেই পরামর্শের জন্যে সর্জকে মসকোতে ডেকে পাঠাল।

বেলডিন বলল সর্জকে এবার যেতে হবে জাপানে। সেখানে অফিস খুলতে হবে। সর্জ রাজি। টোকিয়োতে সে থাকবে। বেল-ডিনকে বলল সে চায়না থেকে ওজাকি এবং ক্লাউসেনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। এরা দু'জন ছাড়া সে রয়েল যুগোশ্লাভিয়া আর্মির প্রাক্তন অফিসার এবং বর্তমানে কয়েকটি সংবাদপত্রের প্রতিনিধি ব্র্যাংকো ডি ভুকেলিচ এবং জাপানী শিল্পী মিয়াজি ইয়োটুকুকেও দলভুক্ত করবে। মিয়াজির সঙ্গে সর্জের আলাপ হয়েছিল কালিফোরনিয়ায়। বেলডিন সব প্রস্তাবেই রাজি হয়ে সম্মতি দিল।

জাপানে যাবার আগে সর্জ একবার জার্মান গেল। জার্মানিতে এসে সে যে কি করে নাৎসী পার্টির সভ্য হল তা সেই জানে, আর একেই তো সে কমিউনিস্ট এবং নাৎসীদের ধোঁকা দিয়ে মেম্বার হওয়া দুরূহ ব্যাপার। এছাড়া সে বিখ্যাত জার্মান খবরের কাগজ ফ্রাংকফুরটার জাইটুঙ্গের টোকিয়োর বিশেষ প্রতিনিধির পদটি লাভ করল। এও এক রহস্য। কেউ জানে না যে সে জার্মান হলেও মসকোর স্পাই। টোকিয়োতে বসে জার্মানির দূতাবাসের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তাদের খবর যোগাড় করা এখন তার পক্ষে জলের মতো সোজা হবে সর্জের বুদ্ধি ও চাতুর্যের তারিফ করতে হয়।

টোকিয়ো যাবার আগে বারলিনের নাৎসী প্রেস ক্লাব সর্জকে একদিন ফেয়ারওয়েল ডিনারে আপ্যায়িত করল। সেই ডিনারে স্বয়ং ডঃ যোসেফ গয়বেলস এবং নাৎসী ফরেন ডিভিসনের চিফ হেয়ার বোল উপস্থিত ছিল। এত দূর গুরুত্ব তাকে দেওয়া হয়েছিল। সে নিজে টোকিয়ো পৌঁছবার আগেই তার নাম টোকিয়ো পৌঁছে গেল। যার বিদায় সম্বধনায় স্বয়ং ডঃ গয়বেলস হাজির থাকেন সে কি একটা যে সে লোক? সর্জ টোকিয়ো যাত্রার পূর্বে ইউরোপের আরও কয়েকটি পত্রিকা তাকে তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে বলল।

টোকিয়ো।

১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসের কোনো এক তারিখের সন্ধ্যায়।

জার্মান এমব্যাসির সামনে দারুণ ভিড়। কত রকমের গাড়ির সার। সেই সব গাড়ি থেকে নামছে জোড়ায় জোড়ায় সুসজ্জিত নারী পুরুষ। বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত ও তাদের পত্নী ও অন্যান্য অফিসার, জাপান সরকারের মন্ত্রী ও তাদের পত্নী, অভিজাত নাগরিক, সাংবাদিক। উচ্চ সমাজের সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হয়েছে।

মস্তবড় ককটেল পার্টি, জাঁকজমকের সীমা নেই যেন।

উপলক্ষ্য হল জার্মান এমব্যাসির মিলিটারি অ্যাটাসে মেজর জেনারেল অয়গেন অট-কে হিটলার পূর্ণ রাষ্ট্রদূতের মর্যাদা দিয়ে তাকে জাপানে জার্মানির অ্যামবাসাডর পদে নিযুক্ত করেছেন।

অট ও তার পত্নী নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করছে, আলাপ করছে, মাঝে মাঝে হাসিতে ফেটে পড়ছে।

অ্যামবাসাডব দম্পতির সঙ্গে আরও একজন ব্যক্তি হাসিমুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে অ্যামবাসাডর অট তারও পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। অট বলছে—

"অ্যালাউ মি টু ইনট্রডিউস মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড ডক্টর রিচার্ড সর্জ আওয়ার ভেরি অ্যাসটিটিউট করেসপণ্ডেন্ট ফ্রম দি ফ্রাংকফুর্টার জাইটুং, এ গ্রেট জার্মান নিউজপেপার।"

এর আগে অবশ্য সর্জের সঙ্গে টোকিয়োতে অনেকেব পরিচয় হয়েছিল কিন্তু সরকারিভাবে তাকে এই প্রথম টোকিয়ো সমাজে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল।

ইতিমধ্যে কেউ কেউ অবশ্য সর্জকে চিনে ফেলেছে। তাই নাকি? লোকটার দর এত বেশি? খোদ অ্যামবাসাডর তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সকলের সঙ্গে পরিচয় দিচ্ছে? আমরা তো জানি লোকটা একটা বোহেমিয়ান, মদ খায় প্রচুব, মেয়েমানুষ দেখলে জমে যায়।

কিন্তু তারা কিছুই জানে না। এটা হল সর্জের আবরণ। আসলে সে হল ক্রেমলিনের একজন বাঘা স্পাই যাকে মস্কো বিশেষভাবে ট্রেনিং দিয়েছে, যাকে মস্কো বিশ্বাস করে। তারা জানে সর্জ যে চর-চক্রের সৃষ্টি করেছে তার তুলনা মেলে না। সে চরচক্র যেমন সন্দেহের অতীত তেমনি সুদক্ষ।

এক সময় পার্টি শেষ হয়, শেষ অতিথিটি চলে যায়। অ্যাম-বাসাডর অট একটা নরম শোফায় ধপ করে বসে পড়ে তারপর সর্জকে কাছে ডেকে বলে—

আমি আমাদের ফরেন অফিসকে জানিয়ে দোব যে এখন থেকে রিচার্ড সর্জ আমার প্রেস অ্যাটাসের কাজ করবে। এমব্যাসির সমস্ত বুলেটিন, নিউজ রিলিজ এসবই সর্জ দেখবে, কি সর্জ তুমি রাজি তো?

সর্জ আর কি বলবে? এ তো মেঘ না চাইতেই জল। তবুও সে বলে: ওরে বাবা, এ কাজ কি আমি পারব? তবে আপনি যখন বলছেন তখন নিশ্চয় আমাকে চেষ্টা করতে হবে।

তুমি পার্টির মেম্বার তো? অট জিজ্ঞাসা করে

কি যে বলেন? সেই কবে থেকে, সেই ১৯৩৩ সাল থেকে, ফুয়েরর যখন ক্ষমতায় এলেন, নিয়মিত চাঁদা দিয়ে যাচ্ছি···

তাহলে তো আর কথাই নেই, নাও গেলাস ঠেকাও

দুজনে গেলাস ঠোকাঠুকি করে সুরায় চুমুক দেয়।

সেই পার্টিতে ওজাকি হোজুমিও উপস্থিত ছিল। সে ও সব দেখল, শুনল, মনে মনে হাসল। এ যেন ক্রেমলিনের সঙ্গে টোকিয়ো এমব্যাসির মধ্যে গুপ্ত খবরের একটা পাইপ লাইন বসে গেল।

সর্জ আর ওজাকি তফাতেই রইল। ওরা যেন পরস্পরকে চেনে না। এই অভাবনীয় সুযোগে সর্জ নিজেও খুব খুশী।

সর্জ ইতিমধ্যে ফ্রাউ অট-এর সঙ্গে এমনভাবে জমিয়েছিল যে সে যেন তাদের পরিবারভুক্ত হয়ে গেল। ওদিকে সযত্নে তার স্পাই রিং গড়ে তুলতে আরম্ভ করল।

চারটি পয়েন্টের ওপর সর্জ গুরুত্ব আরোপ করল। এক: কোন রাশিয়ান তার স্পাই রিং-এ থাকবে না; দুই: জাপানী কমিউনিস্ট পার্টির কেনো মেম্বারও তার দলভুক্ত হবে না; তিন: রাশিয়ান এমব্যাসির সঙ্গে যতদূর সম্ভব কম যোগাযোগ রক্ষা করা হবে এবং চার: তার স্পাই রিং হবে ক্ষুদ্র একটি ইউনিট, ১৬ জনের বেশি নয়।

ওজাকি এখন জাপানে। জাপান সরকারের ওপর মহলের সঙ্গে তার জানাশোনা আছে এমন কি প্রধানমন্ত্রী কনোয়ের সঙ্গে সে সময়

নির্ধারিত না করেই দেখা করতে পারে। সর্জ মারফত অনেক জরুরী খবর ওজাকি মসকোকে জানাতে লাগল।

ক্লাউসেনকেও সর্জ টোকিয়োতে আনিয়ে নিয়েছে। সে তার ব্যবসা হারবিন থেকে টোকিয়োতে তুলে এনেছে। ক্লাউসেন রেডিও সম্বন্ধে একজন এক্সপার্ট। সে ছোট্ট এমন একটা ট্রান্সমিটার তৈরি করল যেটা একটা অ্যাটাচিকেসে ভরে নিয়ে যাওয়া যায় অথচ সেটা এমন শক্তিশালী যে বিশেষ একটি বেতার তরঙ্গে এশিয়ায় রুশ বন্দর ভ্লাডিভস্টকে স্পষ্ট খবর পাঠান যায়।

ক্লাউসেনের একমাত্র ত্রুটি হল সে একটু অন্যমনস্ক, সেজন্যে মাঝে মাঝে সর্জকে বেগ দেয়।

সর্জের স্পাই রিংএ ক্যালিফোর্নিয়া প্রত্যাগত সেই শিল্পী মিয়াজী ইয়োটুকু ছিল। তার স্বাস্থ্য কিছু দুর্বল। সে ওজাকির মেয়েকে ছবি আঁকা শেখাত। এই সূত্রে ওজাকির সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল।

একজন মহিলা কর্মীকে নিয়ে সর্জের চিন্তা ছিল। এই মহিলার নাম কিতাবেয়াসি টোমো। যুদ্ধ বাধবার আগে সে অ্যামেরিকায় থাকত। জাপানের অনেক কমিউনিস্ট নেতার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল। তাদের মারফত মিসেস টোমো খবর সংগ্রহ করত।

মিসেস টোমোর আর একজন বন্ধু ছিল। সেই বন্ধুর নাম ইটো রিতনু, জাপানী কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার এবং ওজাকির বন্ধু। ইটো রিতনু মাঞ্চুরিয়ান রেলরোডে চাকরী করত।

মিয়াজি যখন অ্যামেরিকায় থাকত তখন সে মিসেস টোমোর বাড়িতেই থাকত। তারপর দুজনেই জাপানে ফিরে আসে। মিসেস টোমো তখন জাপানের এক শহরতলীতে বাস করত কিন্তু একটা বোর্ডিং হাউস চালাতো।

এই বোর্ডিং হাউসে প্রধানতঃ কলকারখানার এঞ্জিনিয়াররা থাকত। তাদের মারফতও মিসেস টোমো অনেক খবর বার করে নিত বিশেষ করে সেই সব কলকারখানায় যুদ্ধাস্ত্র কিছু তৈরি হচ্ছে কি না।

সর্জের কাছে মসকো নানারকম প্রশ্ন করে পাঠাত। সর্জ সে সবের সন্তোষজনক জবাব দিত। তবে মসকো যে সব প্রশ্ন করত সে সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সর্জের কাছে ছিল ছেলেখেলা।

সর্জ প্রথম বড় খবর দিল মসকোকে। সর্জ তখন জার্মান এমব্যাসির প্রেস অ্যাটাসে এবং ফ্রাংকফুরটার জাইটুং-এর বিশেষ প্রতিনিধি। জাপানের রাজনীতিব বিশ্লেষণমূলক যে সব ডেসপ্যাচ সর্জ তার পত্রিকাকে পাঠাত তারই বিবরণী সে অ্যামবাসাডর অটকে শোনাত এবং অট বারলিন থেকে প্রাপ্ত অনেক সিক্রেট ডেসপ্যাচ সর্জকে শোনাত। এইভাবে জার্মানির অনেক বড় বড় গুপ্ত খবব সর্জের কানে আসত এবং সর্জ সেগুলি ভ্লাডিভস্টক মারফত মসকোকে জানিয়ে দিত।

প্রথম যে বড় খবরটি টোকিয়ো থেকে সর্জ জানাল সেটি হল যে হিটলার শীঘ্রই চেকোস্লোভাকিয়ার সুডেটানল্যাণ্ড দখল করবে। এই খবব মসকো ইউরোপের কতকগুলি রাষ্ট্রকে জানিয়ে সাবধান করে দিল কিন্তু মসকোর কথা কেউ বিশ্বাস করল না।

এরপর ব্রিটেন ও ফ্রান্সেব প্রধানমন্ত্রী হিটলারের সঙ্গে এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করল যা মিউনিক প্যাক্ট নামে খ্যাত হয়ে আছে। এই চুক্তির ফলে যুদ্ধ থেকে হিটলারকে কিছুদিনের জন্যে নিরস্ত করা গিয়েছিল। ইংলণ্ড তখন যুদ্ধের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। জিব্রাল্টারে তখন একটাও অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান ছিল না।

স্ট্যালিন কিন্তু চিন্তিত হল। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে মিটমাট করে হিটলার রাশিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে নাকি?

সর্জ জানাল ভয় পাবার কিছু নেই। চুক্তিটি সাময়িক। হিটলার ঐ চুক্তি শীঘ্রই ছিঁড়ে ফেলবে।

স্ট্যালিনের ভয় কিন্তু দূর হল না। তার আরও একটা কারণ ছিল। ১৯৩৯ সালের কথা। জার্মানি এবং জাপান একটা চুক্তির জন্যে কথাবার্তা চালাচ্ছিল। সেই চুক্তি সম্পাদিত হলে পশ্চিম দিকে

জার্মানি এবং পূর্ব দিকে জাপান যদি রাশিয়াকে আক্রমণ করে তাহলে স্ট্যালিনের ভয় পাবার কারণ আছে বৈকি, দুটো ফ্রন্টে তাকে লড়াই করতে হবে।

মস্কো থেকে সর্জের ওপর আদেশ এল চুক্তির আলোচনা বানচাল করবার চেষ্টা কর। সর্জের ওপর এতদূর বিশ্বাস। যে কাজ রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতের করা উচিত তার ভার দেওয়া হল সর্জ নামে গুপ্তচরের ওপর।

জাপান সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালনার জন্যে জার্মান প্রতিনিধি দল টোকিয়ো পৌঁছে গেছে।

ওজাকির সঙ্গে সর্জ গোপনে পরামর্শ করল। ওজাকি বলল জাপান কোনোদিন সাইবেরিয়াতে যুদ্ধ করবে না, তার লোভ খনিজ সম্পদে পূর্ণ চীনের মাঞ্চুরিয়ার প্রতি।

অ্যামবাসাডর অটকে সর্জ এই কথাই বোঝাল। জাপানের ওপর নির্ভর করলে ঠকতে হবে। জাপান সাইবেরিয়াতে তার সৈন্য পাঠাবে না। সর্জ একে জার্মান তার ওপর তার বিচারবুদ্ধির ওপর অটের অগাধ বিশ্বাস। জার্মান প্রতিনিধিদলকেও অট এই কথাই বোঝাল।

আর ওদিকে ওজাকি জাপানিদের বোঝাতে লাগল যে সাইবেরিয়ায় লড়াই করে আমাদের কিই বা লাভ? তার চেয়ে মাঞ্চুরিয়া দখল করতে পারলে আমরা অনেক খনিজ পদার্থ পাব চাই কি তেলও পেতে পারি। কথাটা জাপানিদের মনে লাগল।

অতএব জার্মান-জাপ চুক্তি স্বাক্ষরিত হল না। স্ট্যালিন নিশ্চিন্ত হলেন, আপাততঃ সাইবেরিয়া বর্ডার থেকে স্ট্যালিন তার টাফ্ সৈন্যদের সরিয়ে নিল।

স্ট্যালিনকে একটা সুখবর দিল সর্জ। জার্মান-জাপ চুক্তি স্বাক্ষরিত না হওয়ায় হিটলার খুব বিরক্ত হয়েছে। সে তখন চিন্তা করছে রাশিয়ার সঙ্গে একটা অনাক্রমণ চুক্তি করা যায় কিনা। কারণ হিটলারেরও তো ভয় আছে। সে যখন ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের সঙ্গে

যুদ্ধ করবে তখন রাশিয়া যদি তার পিঠে ছুরি মারে? হিটলার এক সঙ্গে দুই ফ্রন্টে যুদ্ধ করতে চায় না। হিটলার শীঘ্রই হয় তো তার বৈদেশিক মন্ত্রী রিবেনটপকে মসকো পাঠাবে।

এরকম একটা খবর বার্লিনে রুশ রাষ্ট্রদূতও শুনেছিল সর্জের প্রতি স্ট্যালিনের বিশ্বাস বেড়ে গেল।

সর্জের কথাই সত্যি হল। দু'মাসের মধ্যে রুশ জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি সই হয়ে গেল। বাল্টিক রাষ্ট্রগুলি ও অর্ধেক পোল্যাণ্ড রাশিয়ার ভাগে পড়ল। এগুলি দখল করলে হিটলার বাধা দেবে না।

কিছুদিন পরেই হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। রাশিয়াও অর্ধেক পোল্যাণ্ড দখল করে নিল।

১৯৪০। গ্রীষ্ম ঋতুর গোড়ার দিক।

হিটলার পশ্চিম ইউরোপের অনেকটা অংশ দখল করেছে। ফ্রান্স পরাজিত, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে করতলগত, ইংল্যাণ্ড ধুঁকছে। হিটলার ভাবল এবার পূর্ব ইউরোপের দিকে মন দেওয়া যেতে পারে। রেড আর্মির আর কিই বা আছে? বিষ দাঁত তো আগেই ভেঙে দিয়েছি। এক মাসের মধ্যেই মসকো পৌঁছে যাব।

বার্লিন থেকে টোকিয়ো এমব্যাসিতে যে সব বার্তা আসছে সেগুলি সর্জ মন দিয়ে পড়ছে। হিটলারের সুর এখন বেশ চড়া। হিটলারের মতলব ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠল। জাপানের সঙ্গে চুক্তি, সেই পুরনো প্রশ্ন নিয়ে হিটলার ভাবছে।

সর্জও ভাবছে হিটলার এবার কি করবে? রাশিয়া আক্রমণ করবে নাকি? সর্জকে বেশি দিন ভাবতে হল না। জার্মানি থেকে একটা নাৎসী ডেলিগেশন জাপানে এল, উদ্দেশ্য জাপানের সঙ্গে একটা সামরিক চুক্তি নিয়ে কথাবার্তা বলা।

সর্জ সঙ্গে সঙ্গে মসকোকে সাবধান করে দিল। হিটলার তার পুরনো খেলনা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। খেলনাটা শীগগির ভাঙবে, সে পূর্ব দিকে ফ্রন্ট খুলবে, জাপানকে আবার বলছে পশ্চিম দিকে ফ্রন্ট খুলতে। যে ডেলিগেশন জাপানে এসেছে তার প্রধান হল চিফ গেস্টাপো এজেন্ট যোসেফ মাইসিঞ্জার। মাইসিঞ্জার ইতিমধ্যে পোল্যাণ্ডে হাজার হাজার ইহুদি নিধন করে 'বিষ্ট অফ ওয়ারসা' নামে পরিচিত হয়েছে। জাপানের জার্মান এমব্যাসির কর্মীরা তাকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করে কিন্তু সর্জ খুব ধূর্ত। লোকটাকে বশ করতে হবে, ওর পেটে অনেক খবর আছে। মসকোতে ঘন ঘন খবর যাচ্ছে।

মাইসিঞ্জারের মুখ দিয়ে একদিন টপ সিক্রেট ফাঁস হয়ে গেল। রাশিয়া আক্রমণের তারিখ হিটলার স্থির করেছে। সর্জ সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়াকে তারিখ জানিয়ে দিল।

স্তালিন তার পলিটব্যুরোর সঙ্গে আলোচনা করতে লাগল। সর্জের কাছ থেকে মার্শাল ভরোশিলভ জাপানের মনোভাব জানতে চাইলেন, তারা কি সাইবেরিয়া আক্রমণ করবে? জাপানকে ঠেকানো যায় না? চেষ্টা করে দেখ না?

ওদিকে জাপানের সঙ্গে জার্মানি চুক্তি নিয়ে কথাবার্তা চালাচ্ছে। এবার হিটলার জাপানের ওপর চাপ দিচ্ছে। সর্জ জানবার চেষ্টা করছে জাপান কি চায়, তার শর্ত কি? ওজাকিও এখন খুব ব্যস্ত। তার কাছ থেকে খবর পাবার জন্যে সর্জ অপেক্ষা করছে।

জাপানের প্রধানমন্ত্রী কনওয়ে একদিন মাইসিঞ্জারকে বলল, তুমি হের হিটলারকে জানিয়ে দিতে পার যে জাপান শীগগির মবিলাইজ করবে, সৈন্য চলাচল আরম্ভ করার নির্দেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সমস্ত কমিউনিস্টদেরও গ্রেফতার করার আদেশ জারী করা হবে।

মাইসিঞ্জার আর বিলম্ব করল না। হিটলারকে দ্রুত খবর জানিয়ে দিল।

সেইদিন সন্ধ্যায় একটা রেলওয়ে ইয়ার্ডে ওজাকির সঙ্গে সর্জের

দেখা হল। মূল খবরটা তো সর্জ আগেই পেয়ে গেছে কিন্তু ওজাকির কাছ থেকে সে বিশদ বিবরণ জানতে চাইল।

ওজাকি বলল, কনওয়ে জার্মানিকে ধাপ্পা দিচ্ছে। হ্যাঁ, জাপান মবিলাইজ করবে তবে তার সৈন্য যাবে দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ চায়নার দিকে। মাঞ্চুরিয়াতে যে জাপানি সৈন্য আছে তাদের ফিরিয়ে এনে অন্য সৈন্য পাঠাবে।

সর্জ খবর পাঠাল, জাপান সাইবেরিয়াতে ফ্রন্ট খুলবে না. চাই কি সে রাশিয়ার সঙ্গে লড়াই করবে না। স্ট্যালিন সর্জের খবরে বিশ্বাস করলেন। সাইবেরিয়া সীমান্তে আবার যে সৈন্য পাঠিয়েছিলেন তার অধিকাংশই আবার প্রত্যাহার করে নিলেন।

ওদিকে জাপানের কাউন্টার এসপিওনেজ বিভাগ কেম্পেতাই সন্দেহ করছে যে টোকিয়োর কোথাও গুপ্ত ট্রান্সমিটার আছে। সেখান থেকে খবর পাচার হচ্ছে।

অনেক সার্চ করেও সেই গুপ্ত ট্রান্সমিটারের খবর পাওয়া গেল না। কি করে পাওয়া যাবে? সর্জ মাছ ধরবার জন্যে ছোট একটা মোটর বোট কিনেছিল। মসকোতে খবর পাঠাবার সময় সে আর ক্লাউসেন সেই মোটরবোটে গিয়ে উঠত। ক্লাউসেনের সঙ্গে থাকত ছোট একটি অ্যাটাচি কেস যার মধ্যে থাকত তার সেই ছোট অথচ শক্তিশালী ট্রান্সমিটারটি।

ওরা দুজনে মোটরবোট চালিয়ে সমুদ্রের ভেতরে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ট্রান্সমিটার চালু করত। ফেরবার সময় অবশ্যই কিছু মাছ নিয়ে ফিরত।

২২ জুন তারিখে হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করল। পঁচিশ দিনের মধ্যে চারশ মাইল ভেতরে ঢুকে গেল তার প্যানজার বাহিনীর ট্যাংক, বন্দীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ৬৫ হাজার।

জার্মান আর্মি প্রথম বাধা পেল স্মলেংক শহরে এসে। এইখানে মোতায়েন ছিল সাইবেরিয়া সীমান্ত ফেরত স্ট্যালিনের ক্র্যাক

ডিভিসন। মসকো বেঁচে গেল। এই কৃতিত্ব পরোক্ষভাবে সর্জেরই।

এদিকে জাপানে কমিউনিস্ট গ্রেফতার চলছে। সাউথ মাঞ্চুরিয়ান রেলরোডের কর্মী সেই ইটো রিটসু একদিন ধরা পড়ে গেল। জেরার সময় সে মিসেস টোমোর নাম বলে দিল। সে বলল, মহিলা বড়ই প্রশ্ন করে, আমার সন্দেহ হয় যে ও অ্যামেরিকান স্পাই।

জাপানের বিশেষ পুলিস বিভাগ টোকোকা মিসেস টোমোর বাড়ির ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখতে লাগল। তিনমাস ধরে তারা নজর রাখল। পুলিস লক্ষ্য করল যে মিয়াজি ইয়োটোকু নিয়মিত আসে। দুজনে একসময় অ্যামেরিকায় থাকত। সন্দেহজনক। পুলিস দুজনকেই গ্রেফতার করল

মিয়াজির বাড়ির ওপরও নজর রাখা হচ্ছিল। এর বাড়িতে ওজাকি হোজুমি প্রায়ই আসে কেন? তাকেও গ্রেফতার করা হল ওজুকি গ্রেফতার হওয়া মানে জালে বড় একটা কাৎলা মাছ পড়ল

দুধর্ষ স্পাই হল ডঃ রিচার্ড সর্জ। জাপান যে তলে তলে পার্ল হারবার আক্রমণ করবার ষড়যন্ত্র করছে এ খবরও ও আগে টের পেয়েছিল এবং রাশিয়াকে জানিয়েছিল সর্জের অনেক গুণ ছিল। কিন্তু নারীর প্রতি দুর্বলতা তার পতনের অন্যতম কারণ।

কি জানি কেন কেম্পেটাইয়ের প্রধান কর্ণেল ওসাকি কিন্তু সর্জকে ভাল চোখে দেখত না। এ কথা সে জার্মান এমব্যাসির অফিসারদের বলেছিল, বলেছিল লোকটার মধ্যে কোনো গুপ্ত ব্যাপার আছে। ওর সাঙ্গপাঙ্গদেরও সন্দেহ হয়। সর্জের বাড়িতে কোনো পার্টি হলে, অতিথিরা চলে গেলে ওজাকি, মিয়াজি, ক্লাউসেন এবং ভুকেলিচ অনেকক্ষণ পর্যন্ত থেকে যায়। কেন? একজনও কি আগে চলে যেতে নেই? কিছু একটা ব্যাপার আছে। জার্মান এমব্যাসি ওসাকির সন্দেহ উড়িয়ে দিল।

কর্ণেল ওসাকি নিজে সর্জের ওপর নজর রাখতে লাগল। সর্জ

এই সময়ে টোকিয়োর ফুজি ক্লাবে প্রায়ই যেয়ে আড্ডা মারত। এক দিন ওসাকি এই ক্লাবে এসে সর্জের সঙ্গে আলাপ করল।

নারী ও সুরার প্রতি সর্জের দুর্বলতা কথা প্রসঙ্গে প্রকাশ হয়ে পড়ল। ওসাকি মনে মনে উল্লসিত হল। নারীর প্রতি দুর্বলতা? তাহলে তো একে সহজেই ফাঁদে ফেলা যাবে।

কথা বলতে বলতে ওসাকি বলল যে আজই এই ফুজি ক্লাবে একজন জাপানি নর্তকীকে দেখা যাবে যার তুল্য সুন্দরী যুবতী নর্তকী জাপানে দ্বিতীয়টি নেই।

নর্তকীর নাম কিয়োমি। ওসাকি ঠিক বলেছে। অপূর্ব সুন্দরী। সর্জ মুগ্ধ হল। কিয়োমিকে তার চাই। কিন্তু কিয়োমি সহজে ধরা দেয় না। সর্জও ছাড়ে না। সে প্রতিদিন সন্ধ্যায় কিয়োমিকে ফুল পাঠায়। দেখা করবার জন্যে অনুরোধ করে।

একদিন নাচের শেষে কিয়োমি তার ড্রেসিংরুমে ঢুকে দেখল যে সর্জ বসে আছে, হাতে ফুলের তোড়া। আর এড়ানো গেল না। ভাব করতেই হল। সর্জ কিন্তু জানতে পারল না যে কিয়োমি হল ওসাকির চর। সর্জকে ধরবার জন্যে ওসাকি ফাঁদ পেতেছে, সেই ফাঁদ হল কিয়োমি।

কয়েকদিন কাটল। সেদিন ফুজি ক্লাবে কিয়োমির প্রোগ্রাম ছিল। কিয়োমি নাচছে। সর্জ একটা টেবিলে বসে সুরা পান করছে আর মাঝে মাঝে কিয়োমিকে দেখছে। কিয়োমিও নাচের ফাঁকে ফাঁকে সর্জকে দেখছে।

একজন ওয়েটার সর্জের টেবিলে পাতলা কাগজের ছোট্ট একটা বল ফেলে দিল। কিয়োমির নজর এড়াল না। কাগজের বলটি তুলে নিয়ে সেটি খুলে হাত দিয়ে মসৃন করে নিয়ে সর্জ সেটি পড়ল। মিয়াজি একটি মেসেজ পাঠিয়েছে, তার ওপর পুলিস আজকাল নজর রাখছে। কাগজটি সর্জ তার পকেটে রেখে দিল।

কিয়োমি ঐ পাতলা কাগজের বলেব কথা টেলিফোনে ওসাকিকে জানাতে দেরি কবল না।

কদিন ধরে সর্জ চিন্তিত। ভুকেলিচেব ওপরও পুলিস নজর রাখছে। ক্লাউসেনও সেইরকম সন্দেহ কবছে। কয়েকটা জরুরী খবর পাঠিয়েই সর্জ আপাততঃ পাট গুটিয়ে ফেলবে ঠিক কবল।

সেদিন সর্জ যথারীতি ফুজি ক্লাবে গেছে, নিজের বিজার্ড টেবিলে বসেছে। সেদিনও একজন ওয়েটাব পাতলা কাগজেব একটি বল তাব টেবিলে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। কিয়োমিও তা লক্ষ্য কবল।

মিয়াজি সতর্ক কবে দিয়েছে, সর্জ তুমি আব দেবি কোরো না, পালাও, পুলিস আমাকে শীগগীব ধববে যদি না ইতিমধ্যে পালাতে পাবি।

কিয়োমির নাচ শেষ হল। কিয়োমিকে সর্জ বোজ শহরের মধ্যে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। সেদিন বলল, চল কিয়োমি ইজু পেনিন-সুলাতে, সেখানেও আমার একটা বাসা নেওয়া আছে। কিয়োমি অবাক হল, কই আগেতো শোনে নি, বিচার্ডেব সেখানেও বাসা আছে।

সর্জ বলল, সেখানে যেয়ে তুমি রান্না কববে, বাত্রিটা ওখানেই থাকবে।

ইজু পেনিনসুলায় যেতে যেতে সর্জ বাস্তায় গাড়ি থামিয়ে পকেট থেকে দুটো সিগাবেট বাব কবল, একটা নিল নিজে আর একটা দিল কিয়োমিকে। তারপব পকেট থেকে বার করল সেই কাগজের টুকরো।

কিয়োমির বুক ঢিব ঢিব করতে লাগল। সর্জ এবার সিগাবেট ধরাবার জন্যে লাইটাব জ্বালাবে। এবং সিগাবেট ধরিয়ে নিশ্চয় কাগজ পুড়িয়ে দেবে। তাহলে তো কোনো প্রমাণই থাকবে না।

কিন্তু হায় লাইটাব জ্বলল না। সর্জ তখন কিযোমিব লাইটাব চাইল। কিয়োমি তার হ্যাণ্ডব্যাগ হাতড়ে বলল লাইটার আনতে ভুলে গেছে। সে মিথ্যা কথা বলল, লাইটার তার ব্যাগে ছিল।

সর্জ বিরক্ত হয়ে সিগারেটটা দুমড়ে এবং কাগজটা ছিঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিল। কিয়োমি যদিও ট্রেনিং প্রাপ্ত স্পাই নয় তবুও সে বুদ্ধিমতী। সে জায়গাটা চিনে রাখল। আর সর্জ ট্রেনিংপ্রাপ্ত ও বুদ্ধিমান স্পাই হয়েও ভুল করল। প্রত্যেক স্পাইকে শেখানো হয় যে কাগজ যদি ছিঁড়তেই হয় তাহলে তা যতদূর সম্ভব কুঁচি কুঁচি করে ছিঁড়বে এবং কখনই একই জায়গায় কুঁচিগুলি ফেলবে না, রাস্তায় বা অন্যান্য বিভিন্ন স্থানে ফেলবে।

সর্জ গাড়ি ছেড়ে দিল। খানিকটা যাবার পর কিয়োমি অনুরোধ করল গাড়িটা একটু থামাও, সামনে ঐ বুথ থেকে বাড়িতে মাকে একটা ফোন করে দেই যে রাত্রে বাড়ি ফিরব না।

সর্জ গাড়ি থামাল। বুথে ঢুকে কিয়োমি আগে ফোন করল কর্ণেল ওসাকিকে। তাকে জানিয়ে দিল কাগজের টুকরো কোথায় পড়ে আছে। তারপর নিজের মাকে ফোন করল।

কিয়োমিকে কিছু রান্না করতে বলে সর্জ বাড়ি থেকে বেড়িয়ে গেল। বলে গেল সে একটা জরুরী কাজ সেরে এখনি আসছে। সর্জ গেল ক্লাউসেনের বাসায়। ট্রান্সমিটার সঙ্গে নিয়ে দুজনে গেল সেই মাছধরা মোটরবোটে।

মোটরবোট থেকে ওজাকির দেওয়া জরুরী একটা খবর ভ্লাডিভস্টকে পাঠিয়ে বলল শেষ খবর পাঠাচ্ছি। আমরা বর্তমানে আর খবর পাঠাব না। জাপানি পুলিস আমাদের সন্দেহ করছে। কেউ কেউ গ্রেফতার হয়েছে। তারপর দুজনে যে যার বাসায় ফিরে গেল। বিদায় নেবার আগে দুজনে হ্যাণ্ডশেক করল। কে জানে আবার কবে দেখা হবে।

ফুজি ক্লাবে যাবার আগে সেইদিনই সন্ধ্যায় সর্জের কাছে ক্লাউসেন এসেছিল। সর্জ অন্ধকারে বসেছিল জানালার ধারে। মিয়াজির দেখা করার কথা ছিল, দুদিন আসে নি। ওজাকিও আসে নি। তারও কোন খবর পায় নি। সর্জ রীতিমতো চিন্তিত।

ক্লাউসেন নিজেও চিন্তিত। সর্জের বাড়ি থেকে ফেরবার পথে একটা মোড় ঘোরবার সময় টোককোকা পুলিসের একজন অফিসারের সঙ্গে তার ধাক্কা লেগে গেল। অফিসারকে ক্লাউসেন চিনত। সে ক্ষমা চেয়ে উল্টো দিকে চলে গেল। ক্লাউসেন ভয় পেয়ে গেল। সে ঠিক করল পরদিন সকালেই সে তার ট্রান্সমিটার এবং কাগজপত্রগুলি সরিয়ে ফেলবে বা নষ্ট করে দেবে। কিন্তু পরদিন সকালেই ক্লাউসেনকে টোককোকার সেই অফিসার বামাল গ্রেফতার করে নিয়ে গেল।

ইজু পেনিনসুলার বাসায় ফিরে সর্জ দেখল কিয়োমির রান্না শেষ। দুজনে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমোতে গেল।

শেষ রাত্রে কর্ণেল ওসাকি এসে সর্জের ঘুম ভাঙাল। ঐ একই সময়ে ক্লাউসেন, ভুকেলিচ এবং ওজাকি গ্রেফতার হল।

রাস্তায় ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া সেই কাগজের টুকরোগুলি ওসাকি সংগ্রহ করে পর পর সাজিয়ে একখানি সাদা কাগজের ওপর আঠা দিয়ে সযত্নে বসিয়েছিল। গ্রেফতারের সময় সেই কাগজখানি সর্জকে ওসাকি দেখাতে ভোলে নি। বিদায় নেবার সময় কিয়োমির দিকে সর্জ একবারও ফিরে চায় নি। সে বুঝতেই পেরেছিল কিয়োমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

মিয়াজির ওপর পুলিস অত্যাচার করেছিল। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মিয়াজি স্বীকারোক্তি করেছিল। ক্লাউসেনও অত্যাচারের ভয়ে স্বীকারোক্তি দিয়েছিল। ওজাকি ও সর্জ মুখ বন্ধ করে রেখেছিল কিন্তু মিয়াজি ও ক্লাউসেনের লিখিত স্বীকারোক্তি পড়ে ওরাও মুখ খুলেছিল। ভুকেলিচ শেষ পর্যন্ত মুখ বুজে ছিল, কিছুই স্বীকার করেনি।

সর্জের গ্রেফতারের খবর পেয়ে অ্যামবাসাডর অট বিচলিত হল, তার ধারণা কোথাও কিছু ভুল হয়েছে। কেন গ্রেফতার করা হয়েছে সে কথা জাপানি পুলিস অটকে বলে নি। জাপানের প্রধান মন্ত্রী তোজো। তোজোর সঙ্গে অট দেখা করল। তোজো তার মুখের

ওপর বলে দিল তোমার প্রেস অ্যাটাসে ডক্টর রিচার্ড সর্জ মস্কোর পয়লা নম্বর স্পাই। আমাদের কাছে অকাট্য প্রমাণ আছে। সর্জ নিজেও স্বীকার করেছে।

গেস্টাপো এজেন্ট মাইসিঞ্জার তখনও টোকিয়োতে ছিল। সুগামো প্রিজনে গিয়ে সর্জের সঙ্গে দেখা করে সে বলে এসেছিল, ইউ ফিল দি কমিউনিস্ট ডগ। হ্যাঙিং ইজ টু গুড ফর ইউ।

মিয়াজি রোগে পড়েছিল। তার বিচার করা সম্ভব হয়নি। অনির্দিষ্ট কাল সে জেল হাসপাতালেই ছিল। ক্লাউসেনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, পরে তা রদ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ভুকো-লিচেরও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

সর্জ এবং ওজাকির ফাঁসির আদেশ হল। ৯ অকটোবর ১৯৪৪ তারিখে একই মঞ্চে আধঘণ্টার তফাতে দুজনের ফাঁসি হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত সর্জ তার সাহসে অবিচল ছিল। রাশিয়া যে যুদ্ধে জয়লাভ করেছে এতে সে গৌরবান্বিত হয়েছিল। ক্যাপিটালিজমের পরাজয়ে সে আনন্দিত হয়েছিল।

আবার আমরা অ্যাটম বোমার কাহিনীতে ফিরে যাই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হতে আর বেশিদিন বাকি নেই।

১৯৪৫ সালের ১৬ জুলাই পটসডাম কনফারেন্সের জন্যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল, মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যান এবং সোভিয়েট রাশিয়ার সর্বময় কর্তা যোসেফ স্ট্যালিন বার্লিনে সমবেত হয়েছেন।

অ্যামেরিকা ত্যাগ করার পরেই সমুদ্রে জাহাজে বসে ট্রুম্যান খবর পেয়েছেন যে পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম অ্যাটম বোমাটি নিউ মেক-সিকোর মরুভূমিতে অ্যালামোগরডো নামে স্থানে সাফল্যের সঙ্গে ফাটানো হয়েছে।

ইস্পাতের তৈরি একটি টাওয়ারের ওপর বোমাটি বসানো হয়েছিল এবং দূর থেকে সুইচ টিপে বোমাটি ফাটানো হয়েছিল। বোমা নির্মাণে যে সকল বিজ্ঞানী অংশ নিয়েছিল তারা কুড়ি মাইল দূর থেকে সেই শক্তিশালী এবং পৃথিবীর প্রথম অ্যাটম বোমাটি ফাটতে দেখেছিল।

সেদিন যে সকল বিজ্ঞানী উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যে ক্লাউস ফুকস ছিল। আসলে সে জার্মান কিন্তু তাকে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছিল।

উইনস্টন চার্চিলের সঙ্গে পরামর্শ করে কনফারেন্সের সময়ে ট্রুম্যান খবরটা স্ট্যালিনকে জানাল। আমরা নতুন একটা সাংঘাতিক মারাত্মক অস্ত্র আবিষ্কার করেছি।

স্ট্যালিন কোনো বিস্ময় প্রকাশ করলেন না; বিচলিতও হলেন না। মৃদু হাসলেন তারপর বললেন, বেশ তো, অস্ত্রটির সদ্ব্যবহার করুন।

কি রকম হল? ট্রুম্যান ভাবলেন, স্ট্যালিন তো আশ্চর্য হল না?

এ কি রকম ব্যাপার। লোকটা কি পাহাড়। কোনো খবরই কি তাকে বিচলিত করতে পারে না? ট্রুম্যান ভাবলেন যেহেতু বোমাটা আমরা তৈরি করে ফেলেছি তাই মনে মনে স্ট্যালিনের হিংসে হয়েছে তাই মনের রাগ মনেই চেপে রাখল।

স্ট্যালিন আশ্চর্য হবেন কেন? তিনি তো এ খবর আগেই জানেন, জানতেন না শুধু বোমা ফাটাবার তারিখ।

ব্রিটেন ও অ্যামেরিকা পারমাণবিক শক্তি নিয়ে যে সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিল তার প্রায় সব খবরই রাশিয়ার গুপ্তচর সংস্থা জি আর ইউ (উচ্চারণ করতে হবে 'গেরু')-এর ডিরেক্টর মারফত স্ট্যালিন ও পলিটব্যুরো পাচ্ছিলেন। বোমা তৈরির মৌলিক সমস্ত নীতিই রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা জেনে গিয়েছিল। কেবল চার্চিল এবং ট্রুম্যানই জানতেন না যে যুদ্ধের এই গোপনতম প্রকল্পের কতখানি স্ট্যালিন জেনে ফেলেছেন।

এই ঘটনার পর দু মাস কেটে গেছে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। ইংলণ্ডে প্রধান মন্ত্রীর পদে ক্লেমেণ্ট অ্যাটলি বসেছেন। এ হেন সময়ে ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী ম্যাকেঞ্জিং কিং প্রথমে ওয়াশিংটনে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানকে ও পরে ইংলণ্ডে প্রাইম মিনিস্টার অ্যাটলিকে জানালেন যে সবনাশ হয়ে গেছে। অ্যাটম বোমার সিক্রেট রাশিয়ানরা জেনে ফেলেছে।

এই সিক্রেট জানবার জন্যে রাশিয়া যে বিস্তারিত জাল পেতেছিল তাও ক্রমশঃ জানা গেল।

রাশিয়া যে অ্যাটম সিক্রেট জেনে ফেলেছে এই খবর মার্কিন বা ব্রিটিশ গুপ্তচর সংগ্রহ করতে পারে নি। খবরটা ক্যানাডাকে যেচে জানিয়েছিল রুশ দূতাবাসের একজন রুশ কর্মচারী অথচ সেই রুশ কর্মচারীকে ক্যানাডার খবরের কাগজওয়ালারা প্রথমে পাত্তাই দেয় নি, ভাগিয়ে দিয়েছিল।

ক্যানাডার রাজধানী অটোয়ার রুশ দূতাবাসে একজন সাইফার ক্লার্ক চাকরী করত তার নাম ইগর গুজেনকো। তার কাজ ছিল সাংকেতিক ভাষায় গৃহীত বার্তাগুলি সরল রুশ ভাষায় রূপান্তরিত করা।

গুজেনকো আসলে ছিল গেরুর লোক। গেরু হল সোভিয়েট সুপ্রিম কমাণ্ডের ফরেন সিক্রেট সারভিস। সে ক্যানাডায় এসেছে মাত্র দু বছর।

৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ তারিখে সন্ধ্যাবেলায় সে দূতাবাস থেকে শেষ-বারের মতো বেরিয়ে এল না। চাকরিতে তার জবাব হয় নি। সে আর দূতাবাসে ফিরে যাবে না। রাশিয়াতেও নয়।

দূতাবাস থেকে বেরিয়ে আসবার সময় দূতাবাসে তার কর্তা নিকোলাই জারোটিনের স্টীল আলমারি থেকে গোপন তথ্যে পূর্ণ অন্ততঃ ১০৯ খানি টাইপ করা পাতলা কাগজ ও টেলিগ্রাম নিজের জামার অন্তরের ভেতর ভরে এনেছে।

ক্যানাডায় নিকোলাই জাবোটিনের সরকারি পরিচয় হল মিলিটারি অ্যাটাসে। আসলে সে হল ক্যানাডায় গেরুর ডিরেক্টর।

সেই ১০৯ খানি সিক্রেট ডকুমেণ্ট গুজেনকো গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বেছে রেখেছিল। ইতিমধ্যে মসকোতে কেন্দ্রে ফিরে যাবার জন্যে তার অর্ডার এসে গিয়েছিল। সে তখনি ঠিক করেছিল যে রাশিয়াতে সে আর ফিরে যাবে না! ক্যানাডায় সে আশ্রয় ভিক্ষা করবে। তবে একা নয়, স্ত্রী ও তার পুত্রও সঙ্গে থাকবে বই কি।

রাশিয়ান এমবাসি থেকে বেরিয়ে গুজেনকো প্রথমে গেল ক্যানাডার বিখ্যাত দৈনিক অটোয়া জার্নালের অফিসে। মনে মনে তার আশা সে তাদের যে বিরাট স্কুপ নিউজ দেবে তা তারা লুফে নেবে।

ক্যানাডার রাজধানী হলেও অটোয়া একটা খুব বড় শহর নয়। লণ্ডন বা নিউইয়র্ক বা প্যারিসের মতো সেখানে বাঘা বাঘা সাংবাদিক থাকে না। তাছাড়া তখন সবে যুদ্ধ শেষ হয়েছে। নামী সাংবাদিকেরা তখন ইউরোপে চলে গেছে।

সাংবাদিকদের পক্ষেও একটা অসুবিধা ছিল। গুজেনকো সঙ্গে যেসব সিক্রেট ডকুমেণ্ট এনেছে, হতে পারে সেগুলি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সবই রুশ ভাষায় লেখা। সংবাদিকেরা কেউ রুশ ভাষা জানে না।

অটোয়া জার্নালের বার্তা বিভাগের সাংবাদিকেরা তাকে বলল এ কাজ আমাদের ক্ষমতার বাইরে। তুমি বরঞ্চ ক্যানাডিয়ান মাউণ্টেড পুলিসের দফতরে যাও। তারা তোমাকে সাহায্য করতে পারবে।

ওরা গুজেনকোকে সন্দেহের চোখে দেখেছিল, কে জানে লোকটার কি মতলব। ওর মুখের কথা শুনে খবর ছেপে কি ওরা বিপদে পড়বে? তাছাড়া আরও একটা কথা ছিল। গুজেনকো যদি সত্যিই রাশিয়ান এমবাসি থেকে পালিয়ে এসে থাকে তাহলে রুশরা তো তাকে সহজে ছাড়বে না। তার জীবন সংশয়। তাকে কে বাঁচাবে? যা করবার ক্যানাডিয়ান মাউণ্টেড পুলিস করতে পারে।

অটোয়া জার্নালের অফিসে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল।

গুজেনকো আরও দু'একটা খবরের কাগজের অফিস ঘুরে মিনিষ্ট্রি অফ জাষ্টিসে এল। তখন বেশ রাত্রি। প্রায় বারোটা বাজে। অত রাত্রে অফিসে দায়িত্বশীল কোনো ব্যক্তি থাকতে পারে না। তাকে পরদিন সকালে আসতে বলা হল।

গুজেনকোর তখন গা ছম ছম করছে। সোভিয়েট গুপ্ত পুলিস যদি একবার টের পায় তাহলে তাকে ধরবে। সে কেন সন্দেহজনক-ভাবে ঘোরাফেরা করছে? এত রাত্রি হল সে এখনও তার ফ্ল্যাটে ফেরেনি কেন? গুজেনকো ভয় তো পাবেই। তার গরম কোটের মধ্যে লুকানো রয়েছে 'ডাইনামাইট'।

ভয় তো বটেই তার ওপর এমব্যাসি থেকে বেরোবার পর তার কিছু খাওয়া হয় নি। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর। সে তার ফ্ল্যাটে ফিরে গেল। সারারাত্রি তার ঘুম হল না। সে যদি ব্যর্থ হয় তাহলে সে কি করবে? নিজের জন্যে চিন্তা নয়, সঙ্গে স্ত্রী ও বাচ্চা রয়েছে। স্ত্রী আবার অন্তঃস্বত্ত্বা, প্রসবের সময় হয়ে এসেছে।

পরদিন সকালে মিনিস্ট্রি অফ জাস্টিসের দফতর খুলতে না খুলতে গুজেনকো তার গর্ভবতী স্ত্রী ও বাচ্চাকে নিয়ে দফতরে হাজির। সে খুব সতর্কতার সঙ্গে এবং ভয়ে ভয়ে রাস্তায় চলাফেরা করছে, কে জানে দূতাবাসের কোনো কর্মী তাকে যদি দেখে ফেলে! অটোয়ার রাস্তায় মোটেই ভিড় নেই। দ্রুত আত্মগোপন করা যায় না।

যাই হোক গুজেনকো তো দফতরে হাজির হল। তখন এই দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন লুই সেণ্ট লরেণ্ট। উত্তরকালে তিনি ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী হয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

গুজেনকো তাঁর সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করল। সেক্রেটারি মন্ত্রীর সঙ্গে ফরাসি ভাষায় কথা বলল। গুজেনকো ফরাসি ভাষা জানে না, কি কথা হল কে জানে। সেক্রেটারি বলল, মিঃ সেণ্ট লরেণ্ট তার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না। সেক্রেটারিরও কিছু করনীয় নেই। কি আর করা যায়, গুজেনকো ফিরে গেল।

কিন্তু যাবে কোথায়? সে আবার অটোয়া জার্নালের অফিসে গেল। এবার তাকে কোনো কথা বলতেই দেওয়া হল না, পত্রপাঠ বিদেয় করে দেওয়া হল।

পত্রিকা আফসের একজন যুবতী রিপোর্টার তাকে ডেকে এনে পরামর্শ দিল তুমি ক্যানাডিয়ান নাগরিকত্বের জন্যে আবেদন কর। আবেদন কর বললেই করা যায় না। নানা ঝামেলা আছে।

স্ত্রী ও বাচ্চাকে নিয়ে গুজেনকো এ দরজা থেকে ও দরজা ঘুরে বেড়াতে লাগল ক্রাউন অ্যাটর্নির অফিসের একজন সহানুভূতিশীল মহিলা কর্মী দয়াপববশ হয়ে তাব পরিচিত অন্য একটি পত্রিকার রিপোর্টারকে ডেকে পাঠাল।

নতুন রিপোর্টার এসে সব শুনে বলল, আরে এ তো দেখছি বিরাট ব্যাপার। এত বড় ব্যাপার সামলাবার ক্ষমতা আমার তো নেই, আমার কাগজেরও নেই। ঐ একশ ন পাতার সিক্রেট ডকুমেন্ট অনুবাদ করাতে হবে তারপর সেই সব ডকুমেন্ট খতিয়ে দেখতে হবে। তাবপর রিপোর্ট তৈরি করতে হবে, অনেক ঝামেলা। আমি পারব না এমন কি বর্তমান পরিস্থিতিতে ক্যানাডার কোনো কাগজই পারবে না।

গুজেনকো এখন কি করবে? সেই সকাল থেকে সে বৌ আর ছেলেকে নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সারাদিন অফিস যায় নি। হয়তো কেউ তার ফ্ল্যাটে টেলিফোন করেছিল, জবাব পায়নি।

ক্যানাডায় কেজিবি এজেন্টরা এতক্ষণে তাকে হয়তো খুঁজে বেড়াচ্ছে। নিশ্চয় খুঁজে বেড়াচ্ছে। কোন সন্দেহ নেই। তারা হয়তো জাবোটিনের স্টীল আলমারি খুঁজে দেখেছে; কিছু গোপন নথি পত্তর পাওয়া যাচ্ছে না।

কেজিবি এজেন্ট তাকে যদি ধরতে পারে তাহলে মৃত্যু এবং বৌ ও ছেলের নিশ্চয় নির্বাসন। তবে একটু ক্ষীণ আশা আছে। এটা ক্যানাডা। কেজিবি চট করে কিছু করতে পারবে না। কিন্তু গুপ্তঘাতক যদি অন্ধকার রাত্রে তাকে লক্ষ্য করে গুলী করে?

শেষ পর্যন্ত নিরাশ ও ক্লান্ত গুজেনকো রাত্রিবেলায় বৌ ও ছেলেকে নিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে এল। ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছিল।

গুজেনকোর পাশের ফ্ল্যাটে থাকত রয়েল ক্যানাডিয়ান এয়ার-ফোর্সের সার্জেণ্ট, নাম হ্যারল্ড মেন। তার সঙ্গে গুজেনকোর বন্ধুত্ব ছিল। গুজেনকো তাকে ডেকে সবকিছু খুলে বলল সেই সঙ্গে নিজের ও বৌ ছেলের বিপদের কথাটাও বলল।

হ্যারল্ড সব মন দিয়ে শুনল। গুজেনকো তাকে অনুরোধ করল বৌ ও ছেলেকে হারল্ড যদি রাত্রিবেলায় তার ফ্ল্যাটে আশ্রয় দেয় কারণ আজ রাত্রে কেজিবি নিশ্চয় তার ফ্ল্যাটে হানা দেবে।

হ্যারল্ড রাজি হল। গুজেনকোর বৌ ও ছেলে তার ফ্ল্যাটে আসবার পরই হ্যারল্ড পুলিসকে ফোন করল। রাশিয়ার কেজিবি-কে সে গ্রাহ্য করে না। এদেশে ওরা কী হামলা করবে?

ফোন করার কয়েক মিনিট পরেই পুলিস এসে হাজির। হ্যারল্ড তাদের বলল যে আজ রাত্রে রাশিয়ান এমব্যাসির সিকিউরিটি গার্ডরা তাদের বিল্ডিং-এর কোনো ফ্ল্যাটে হামলা করতে পারে। পুলিস বলল তারা দুজন জবরদস্ত কনস্টেবল পাঠিয়ে দিচ্ছে। তারা বাইরে থেকে বিল্ডিং-এর ওপর নজর রাখবে এবং সত্যিই যদি রাশিয়ানরা হামলা করে তাহলে তার ব্যবস্থা করবে।

গুজেনকো রাত্রে নিজের ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে অন্য একটা ফ্ল্যাটে ঘুমোতে যাবার আগে ব্যালকনি থেকে লক্ষ্য করল যে দু'জন লোক তার ফ্ল্যাটের দিকে চেয়ে আছে।

হ্যারল্ড যে পুলিসে খবর দিয়ে পুলিস আনিয়েছিল এ খবর গুজেনকোর জানা ছিল না। সে ধরে নিল ওরা নিশ্চয় জাকোটিন প্রেরিত স্পাই।

অন্য ফ্ল্যাটের নিরাপদ আশ্রয়ে কোমল বিছানায় শুয়েও গুজেনকো নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারছে না। পরিশ্রান্ত তাই মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ছে কিন্তু পরক্ষণেই ঘুম ভেঙে যাচ্ছে।

গুজেনকো যখনই ঘুমিয়ে পড়ছে তখনই স্বপ্ন দেখছে। আশ্চর্য। সে কি স্বপ্ন দেখছে? এমব্যাসি থেকে সে কিভাবে পালিয়ে এল। সেখানে কী কী ঘটনা ঘটল এই সব তার চোখের সামনে সিনেমার ছবির মতো ভেসে উঠছে একের পর এক।

যদিও মসকোতে ফিরে যাবার আদেশ এসে গিয়েছিল তবুও বড় কর্তা জারোটিন কিছু দিন আগে থেকে তাকে যেন বিশ্বাস করছিল না। বলেই দিয়েছিল তামার সাইফার ডি-কোড করার কাজ লেফটেনান্ট কুলাকভকে বুঝিয়ে দাও। সে তোমার জায়গায় কাজ করবে। জারোটিনের একবার যখন অবিশ্বাস জন্মেছে তখন কে জানে কি হয়। মসকোয় ফিরে গেলে তাকে হয়তো শাস্তি দেওয়া হবে অতএব পালাতে হলে এখান থেকেই পালানো বুদ্ধিমানের কাজ নইলে আর পালানো যাবে না।

তবে শুধু হাতে পালাবে না। সঙ্গে কিছু নিয়ে যাবে। ক্যানাডা সরকারকে কিছু না দিলে তারা আশ্রয় দেবে কেন? সঙ্গে কি কি সিক্রেট ডকুমেন্ট নেবে গুজেনকো সেগুলি আগে থেকে চিহ্নিত করে রেখেছিল

এই ডকুমেন্টগুলি পেলে ক্যানাডা, ব্রিটেন, আমেরিকা জানতে পারবে তাদের অ্যাটম বোমা রহস্য আর গোপন নেই। ফাঁস হয়ে গেছে।

গুজেনকো প্রথমে ঠিক করেছিল শনিবার পালাবে তাহলে সোমবার পর্যন্ত খবর কেউ পাবে না কিন্তু পরে অনেক ভেবে ঠিক করল বুধবার পালাবে। বুধবার জারেটিনের বাইরে কোথাও কাজ ছিল, ফিরবে পরদিন দুপুরে।

বুধবার বিকেলে ছুটির পর গুজেনকো বাইরে গিয়ে কিছু খেয়ে এল। তার মতলব সাইফার রুমে সে বেশিক্ষণ কাজ করবে। তারপর সুযোগ বুঝে রাত্রে সিক্রেট ডকুমেন্টগুলি নিয়ে সরে পড়বে। সাইফার রুমে সে যখন ইচ্ছে ঢুকতে ও বেরোতে পারত। সেই-ভাবেই তাকে গেট পাস দেওয়া হয়েছিল।

সাইফার রুমের ভেতরে কুলাকভের থাকবার কথা। সারারাত জেগে সে পাহারা দেবে। বাইরে টিফিন করে এমব্যাসিতে ফিরে এসে দেখল যে কুলাকভ অন্য একটা দফতরে বসে আছে আর সাইফাররুমের গেটের সামনে ক্যাপটেন গালকিন পায়চারি করছে।

গালকিন তাকে দেখে বলল, যাক ইগর এসে গেছ। জরুরী কাজ আছে নাকি?

গুজেনকো বলে জরুরী না হলেও কিছু কাজ তাকে আজ রাত্রে শেষ করে রাখতে হবে। কাল সকালে অফিসে এসেই জাবোটিন দেখতে চাইবে।

তাহলে চল সিনেমা দেখে আসি। একা একা ভাল লাগছে না। ফিরে এসে কাজ করবে এখন।

সিনেমায় যেয়ে গুজেনকো কিছুক্ষণ ছবি দেখে বলল, আরে এ তো পুরনো ছবি, আমি দেখেছি। দূর আমার ভাল লাগছে না; আমি চললুম। তুমি বোসো, আমি বরঞ্চ বাইরে যেয়ে একটা মেয়েকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এই বলে গুজেনকো কেটে পড়ল।

সে এমব্যাসিতে ফিরে এল। সাইফার রুমে ঢুকতে যাবে এমন সময় দেখতে পেল দূরে একটা চেয়ারে বসে কেজিবি-এর রেসিডেন্ট ডিরেক্টর ভিটালি প্যাভলভ খবরের কাগজ থেকে কি নোট করছে। ভাগ্যক্রমে সে দিকে তার এত গভীর মনেযোগ ছিল যে গুজেনকোকে সে লক্ষ্য করে নি।

ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল। কয়েক মিনিট পরে আবার সে ঘুমিয়ে পড়ল। দুশ্চিন্তা থাকলেও সারাদিন তো খুব পরিশ্রম হয়েছে। খুবই ক্লান্ত। ঘুম আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার স্বপ্ন।

সাইফার রুমে একটা লোহার গেট। গেটে যে পাহারা দিচ্ছিল তার সঙ্গে গুজেনকোর খুব বন্ধুত্ব আছে। তাকে গুজেনকো বলল আধঘণ্টাখানেক কাজ করে নাইট শোয়ে সে সিনেমায় যাবে।

ভেতরে ঢুকে গুজেনকো নিজের ঘরে ঢুকল। এই ঘরেই আছে জাবোটিনের কাগজপত্র ও ফাইল রাখবার বিশেষ একটি স্টীল ক্যাবিনেট। গুজেনকোর তখন হাত কাঁপছে, বুক ঢিব ঢিব করছে।

এই ফাইল ক্যাবিনেটে একটা চামড়ার ব্যাগের মধ্যে একটা ব্যাগে থাকে টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট। গুজেনকো আগেই তো ১০৯ খানা ডকুমেন্ট বেছে চিহ্ন করে রেখেছিল। এগুলো সে তার গরমকোটের লাইনিং-এর ভেতর এবং কিছু তার শার্টের ভেতর ভরে নিল। ১০৯ খানা হলেও কাগজ খুব পাতলা।

ডকুমেন্টগুলি চুরি করে গুজেনকো কয়েকটা টেলিগ্রাম ডি-কোড করে জাবোটিনের টেবিলে রেখে এল। তারপর ঘর বন্ধ করে সেই রক্ষীর হাতে চাবি দিয়ে দেখল পাভলভ তখনও বসে আছে কিনা।

পাভলভ সাংঘাতিক লোক। উত্তেজনায় গুজেনকোর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল। কিন্তু তার কপাল ভাল। পাভলভ একটু আগে ওপরে তার কোয়ার্টারে চলে গেছে। গুজেনকোর ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছেড়ে গেল।

আর কোন বাধা নেই। গুজেনকো এমব্যাসি থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। গেটে যে গার্ড পাহারা দিচ্ছিল তাকে বলল 'গুড নাইট', কোনোদিন যা বলে না।

গুজেনকো তখন স্বপ্ন দেখছে রাস্তা দিয়ে যেন একটা লরি ভীষণ আওয়াজ করতে করতে এমব্যাসির সামনে দিয়ে যাচ্ছে।

ঘুমটা আচমকা ভেঙে গেল কিন্তু আওয়াজ থামল না। কিসের আওয়াজ? কারা যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। গুজেনকো খাট থেকে উঠে পড়ল। দরজায় চিঠি ফেলবার জন্যে একটা ফাঁক ছিল। গুজেনকো সেই ফাঁক দিয়ে দেখল স্বয়ং পাভলভ।

কেজিবি-এর পাভলভ যাকে সবাই ভয় পায়। একা আসেনি, সঙ্গে তিনটে গার্ড এনেছে। গুজেনকো চোখ রগড়ে সভয়ে দেখল

পাভলভ তার ফ্ল্যাটের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। কোনোরকম সাড়া না পেয়ে একটা যন্ত্র দিয়ে ডোরলক খুলে ফেলল।

ইতিমধ্যে ফ্ল্যাটের একজন বাসিন্দা পুলিসকে টেলিফোন করেছে। কয়েকজন রাশিয়ান পুলিস বে-আইনীভাবে তাদের বিল্ডিং-এ ঢুকে ফ্ল্যাটে জোর করে প্রবেশ করেছে। যে দু'জন কনস্টেবল বাইরে বসেছিল একজনের তারাও ওপরে উঠে এসেছে এবং টেলিফোন পেয়ে আরও পুলিস সমেত একজন ইন্সপেক্টর এসে গেছে।

পাভলভ বলল এই ফ্ল্যাট রাশিয়ার কূটনীতিক অধিকারে আছে; তাদের একজন লোক ও জরুরী কাগজপত্র পাওয়া যাচ্ছে না অতএব ফ্ল্যাট সার্চ করবার অধিকার তাদের আছে।

ক্যানাডিয়ান পুলিস ইন্সপেক্টর বলল, কিন্তু বিল্ডিং-এ বেআইনী-ভাবে প্রবেশ করে রাত্রিবেলায় অন্যান্য ব্যক্তির শান্তি নষ্ট করার অধিকার তাদের নেই।

পাভলভ লোকটা গোঁয়ার। সে কখনও বাধা পায় নি কিন্তু যখন বুঝল যে এটা ভিন্ন দেশ তখন সে মানে মানে সদলে বিল্ডিং ছেড়ে চলে গেল কিন্তু যাবার আগে শাসিয়ে গেল সহজে ছাড়বে না, সে দেখে নেবে কেমন তাদের লোককে লুকিয়ে রাখা হয়।

পাভলভের এই শাসানির ফলে গুজেনকোর সুবিধে হল। ক্যানাডিয়ান সংবাদপত্র বা কর্তৃপক্ষকে সে যা বোঝাতে পারে নি সেই কাজটি তার হয়ে পাভলভ করে দিল। পাভলভের একটা টেলিফোনেই কাজ হল।

পাভলভ সেই রাত্রেই ক্যানাডার পররাষ্ট্র দফতরে টেলিফোন করে জানাল যে তাদের একজন কর্মী কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র নিয়ে উধাও হয়েছে। তাকে তাদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হক। ক্যানাডার পররাষ্ট্র দফতর বুঝল যে বিরাট কিছু ঘটে গেছে নইলে এত রাত্রে পাভলভ ফোন করত না।

পরদিন ভাল করে সকাল হতে না হতেই রয়েল ক্যানাডিয়ান

মাউন্টেড পুলিসের একজন সিনিয়র অফিসার গুজেনকোর ফ্ল্যাটে এসে হাজির। সে গুজেনকোর বৌ অ্যানা এবং ছেলে আন্দ্রেসমেত গুজেনকোকে নিয়ে গিয়ে তুলল মিনিস্ট্রি অফ জাষ্টিস ভবনে যেখান থেকে গুজেনকো আগেই ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে।

এখানে ক্যানাডার গুপ্তচর বিভাগের লোকেরা গুজেনকোকে পাঁচ ঘণ্টা ধরে নানারকম জেরা করল। গুজেনকোর জবানবন্দী শুনতে শুনতে তারা তো অবাক। এমন যে ঘটতে পারে তা বিশ্বাস করাই যায় না কিন্তু দেখা গেল ঘটেছে। ক্যানাডা বা মার্কিন সরকারের বহু গোপন তথ্য সোভিয়েট রাশিয়ায় পাচার হয়েছে না এ লোককে তো ছাড়া হবে না।

গুজেনকো, অ্যানা ও আন্দ্রের নিরাপত্তার সব ভার ক্যানাডা পুলিস গ্রহণ করে উপরওয়ালাদের কাছে রিপোর্ট করল। পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকেঞ্জি কিং-এর কানেও ঘটনাটি তোলা হল। প্রাইম মিনিস্টার ব্যাপারটির নিজেই ভার নিলেন এবং গুজেনকোর বিষয় খোঁজখবর নিতে বললেন। তিনি বললেন যে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত চব্বিশ ঘণ্টা পরে জানাবেন।

ইতিমধ্যে গুজেনকোদের লুকিয়ে রাখা হল। ক্যানাডার একটি নির্জন বিমান ঘাঁটির পাশে তাদের রাখা হল। তাদের সতর্ক করে দেওয়া হল তারা যেন তাদের ঘরের বাইরে না আসে। জানালা দিয়ে বাইরে দেখাও নিষেধ করে দেওয়া হল।

গুজেনকোর বৌ ছিল আসন্নপ্রসবা। তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল। হাসপাতালের খাতায় তার ও তার স্বামীর নাম গোপন রাখা হল। ইতিমধ্যে গুজেনকোকে জেরা করা চলতে লাগল। গুজেনকো অক্লান্ত ভাবে সহযোগিতা করে চলল।

গুজেনকোর চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তির পূর্ণ বিবরণী প্রধান মন্ত্রী ম্যাকেঞ্জি কিংকে জানান হল। গুজেনকো যা স্বীকার করেছিল তা আমেরিকানরা শুনেই বলেছিল 'এ তো ডাইনামাইট'।

আশ্চর্য! মসকোর সরাসরি নির্দেশে ক্যানাডার সোভিয়েট দূতাবাস ক্যানাডার সবকারী অফিসে ও গ্রেট ব্রিটেনের হাই কমিশনারের অফিসে অনেক গুপ্তচর নিয়োগ করেছে। রীতিমতো স্পাই নেটওয়ার্ক।

সোভিয়েট দূতাবাসের মিলিটাবি অ্যাটাশে রূপে যে ব্যক্তিটির পরিচয় সেই কর্নেল জাবোটিন যে এই সকল গুপ্তচরদের নির্দেশ দেয় এবং তার কোডনেম যে 'গ্র্যাণ্ট' এ খবব ম্যাকেঞ্জি কিং-এর জানা ছিল না।

প্রধানমন্ত্রী কিং শংকিত হয়ে উঠলেন। কাউণ্টাব ইনটেলিজেন্স অফিসারদেব তিনি জিজ্ঞাসা করলেন অনটাবিওব চক বিভার অ্যাটমিক প্ল্যাণ্টেও তো দেখা যাচ্ছে সোভিয়েট স্পাই কাজ করছিল, তাহলে কি আমাদের পাবমাণবিক অস্ত্রের খবব কিছু কি ফাঁস হয়েছে?

কাউণ্টার ইনটেলিজেন্স অফিসার মুখে কিছু না বলে দুখানি টেলিগ্রাম প্রধান মন্ত্রীর হাতে তুলে দিল যাব মর্মার্থ হল নিম্নরূপ :— প্রথম টেলিগ্রামখানি অটোয়াতে সোভিযেট এমব্যাসিতে এসেছে ১৯৪৫ সালের ৩০ জুলাই। টেলিগ্রাম মসকো থেকে ডিরেক্টব পাঠাচ্ছে গ্র্যাণ্ট অর্থাৎ জাবোটিনকে। টেলিগ্রামে গ্র্যাণ্টকে বলা হয়েছে 'অ্যালেক' যাত্রা কববার পূর্বে ইউরেনিয়ম কাজের কতদূব কি হল জেনে নাও। তাব কাছ থেকে আরও জেনে নাও যে লণ্ডন যাওয়া কি তার পক্ষে জরুরী। সেখান থেকে সে কি অমাদের কাজ চালাতে পারবে?

অ্যালামোগরডো মরুতে প্রথম বোমা ফাটার খবর যে তারিখে ট্রুম্যান স্ট্যালিনকে জানায় তার চারদিন পরে মসকো থেকে টেলিগ্রামটি পাঠান হয়।

দ্বিতীয় টেলিগ্রাম অটোয়া থেকে গ্র্যাণ্ট ডিরেক্টরকে পাঠাচ্ছে ৯ আগস্ট তারিখে। তার আগে জাপানের ওপর অ্যাটম বোমা

ফাটানো হয়েছে। গ্র্যাণ্ট লিখছে যে অ্যালেক তাকে জানিয়েছে অ্যালামোগরডের মরুভূমিতে যে বোমা প্রথমে ফাটানো হয় তাতে '৯৪' এবং '৯৪-২৩৯' ইউরেনিয়ম আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়েছিল এবং জাপানে যে বোমা ফাটানো হয়েছে তাতে ইউরেনিয়ম ২৩৫ ব্যবহার করা হয়েছে। অ্যামেরিকায় ক্লিন্টন ম্যাগনেটিক সেপারেশন প্ল্যাণ্টে দৈনিক ৪০০ গ্রাম আন্দাজ ২৩৫ ইউরেনিয়ম উৎপাদিত হচ্ছে ...ইত্যাদি কিছু টেকনিক্যাল বিবরণ আছে। তারপর লেখা আছে নমুনা স্বরূপ অ্যালেক তাকে প্ল্যাটিনামে আচ্ছাদিত ১৬২ মাইক্রোগ্রাম ইউরেনিয়ম ২৩৩ দিয়েছে।

এই নমুনা জিআরইউ-এর একজন বিশেষ দূত মারফত মস্কোতে পাঠান হয়েছে। এই খবর গুজেনকো দিয়েছিল।

ম্যাকেঞ্জি কিং জিজ্ঞাসা করলেন, এই স্পাই অ্যালেক কে?

এর উত্তর কেউ দিতে পারল না তবে জারোটিন প্রেরিত একটা বার্তায় অ্যালেকের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া গেল মাত্র। গুজেনকো দূতাবাস ত্যাগ করবার মাত্র দু দিন আগে বার্তাটি পাঠান হয়েছে।

সেই বার্তা থেকে জানা যায় যে ডিসেম্বর মাসে অ্যালেক ক্যানাডা থেকে লণ্ডন যাচ্ছে সেখানে কিংস কলেজে সে চাকরি করবে। অ্যালেক তার আগে আর একবার লণ্ডন যাবে। গ্রেট রাসেল স্ট্রীটে ব্রিটিশ মিউজিয়মের সামনে ৭, ১৭ অথবা ২৭ অকটোবর তারিখে গেরুর একজন এজেণ্ট বেলা ১১টার সময় তার সঙ্গে দেখা করবে। অ্যালেকের হাতে থাকবে একখানা লণ্ডন টাইমস এবং পাসওয়ার্ড হবে 'রিগার্ড টু মিকেল'।

ব্যাপার স্যাপার দেখে তো ম্যাকেঞ্জি কিং স্তম্ভিত। না, কোন সাংকেতিক বার্তা দ্বারা নয়। এই সব বার্তার ওপর আর নির্ভর করা যায় না। তিনি নিজেই প্রথমে ওয়াশিংটনে ও পরে লণ্ডনে যেয়ে কর্তাদের জানাবেন যে অ্যাটম বোমার সমস্ত গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে গেছে।

২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে ম্যাকেঞ্জি কিং ওয়াশিংটন যাত্রা করলেন। এয়ারপোর্টে নেমে তিনি সোজা হোয়াইট হাউসে গেলেন। ব্যাপার গুরুতর।

আগেই খবর দেওয়া ছিল ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী ম্যাকেঞ্জি কিং বিশেষ জরুরী পরামর্শের জন্যে আসছেন। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের প্রাইভেট চেম্বারে সেক্রেটারি অফ স্টেট জেমস বায়রনস এবং ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের ডিরেক্টর জে এডগার হুভার ক্যানাডার প্রধান মন্ত্রীর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

ম্যাকেঞ্জি কিং একখানা রিপোর্ট তৈরি করেই নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রথমে তিনি নিজ মুখেই সব কিছু বললেন তারপর ট্রুম্যানকে রিপোর্টখানা দিলেন। এ বিষয়ে আরও খোঁজ-খবর করা দরকার এবং অবিলম্বে যেন কাজ আরম্ভ করা হয়। এই জন্যেই এফ, বি, আই, চিফ হুভারকে উপস্থিত থাকার জন্যে অনুরোধ করা হয়েছিল।

ম্যাকেঞ্জি কিং এক দিনের বেশি ওয়াশিংটনে অপেক্ষা করলেন না। তিনি এলেন নিউ ইয়র্কে। তিনি 'কুইন মেরি' জাহাজে উঠলেন এবং ৬ অকটোবর তারিখে সাদাম্পটন বন্দরে নামলেন।

ইংলণ্ডের তখন প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেণ্ট অ্যাটলি তখন প্রধান মন্ত্রীর কান্ট্রি হাউস চেকার্স-এ ছুটি কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু প্রধান মন্ত্রীদের ছুটি বলে কিছু নেই। তাই সুদূর ক্যানাডা থেকে ছুটে এসেছেন সে দেশের প্রধান মন্ত্রী।

জাহাজ থেকে নেমে ম্যাকেঞ্জি কিং মোটরে সোজা চেকার্স-এর পল্লীভবনে হাজির হলেন। সেখানে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন অ্যাটলি স্বয়ং তো বটেই উপরন্তু স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দুই প্রধান। ব্রিটেনের গুপ্তচর সংস্থা এম, আই, ফাইভের অফিসারদের ডেকে পাঠান হল।

খবর শুনে তো অ্যাটলি সাহেব ট্রুম্যানের মতোই স্তম্ভিত।

তিনি তখনি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের স্পেসাল ব্র্যাঞ্চের কমাণ্ডার লেনার্ড বার্টকে আদেশ দিলেন অ্যালেককে খুঁজে বার কর।

আলেককে খুঁজে বার করতে বিশেষ অসুবিধে হয় নি। কারণ জাবোটিন প্রেরিত বার্তায় সূত্র ছিল। তবে অ্যালেক কিন্তু নির্ধারিত কোনো তারিখেই ব্রিটিশ মিউজিয়মের সামনে হাজির হয় নি।

তখন কিংস কলেজে খোঁজ করা হল।

অ্যাটম বোমা তৈরি প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছিল ম্যানহাটান প্রজেক্ট। ব্রিটেনে কোডনেম ছিল 'টিউব অ্যালয়' প্রজেক্ট।

কিংস কলেজকে জিজ্ঞাসা করা হল অ্যামেরিকার টিউব অ্যালয় প্রজেক্ট থেকে ছাড়া পেয়ে কোন বিজ্ঞানী এখানে ডিসেম্বর মাসে চাকরিতে যোগ দেবে কি না।

ম্যানহাটান প্রজেক্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেও জানতে চাওয়া হল তারা কোন কোন ব্রিটিশ বিজ্ঞানীকে হালে ছেড়ে দিচ্ছেন কি।

উভয় সূত্র থেকেই একটা নাম পাওয়া গেল। নামটি হল ডক্টর অ্যালান নান মে, বয়স তেত্রিশ, সামনে টাকা পড়ছে, চোখে স্টীল ফ্রেমের চশমা, হিটলারের মতো গোঁফ। ফিজিক্সের রিডার হিসেবে কিংস কলেজে যোগ দেবে। কেনসিংটনে স্ট্যাফোর্ড টেরাসে বাসস্থান।

যদিও তার বাসস্থানে আপত্তিজনক কিছু পাওয়া যায় নি কিন্তু অনুসন্ধান করতে করতে জানা গেল যে কমিউনিস্টদের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে।

নান মে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েরই ডক্টরেট। ১৯৩৬ সালে নান মে ডি-ফিল হয়েছিল। সেই সময়ে হিটলার ইয়োরোপে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। তখনকার ইংরেজ বুদ্ধিজীবীরা সকলেই হিটলার ও নাৎসীবাদের নিন্দায় মুখর। নান মে ব্যাতিক্রম। সে বামপন্থী। ডক্টরেট পাবার কিছুদিন পরেই নান মে সোভিয়েট রাশিয়ায় গিয়েছিল এবং কয়েক সপ্তাহ লেনিন-

গ্রাডে ছিল। সেই সময়েই বোধহয় সোভিয়েট সিক্রেট সার্ভিসের খাতায় মে নাম লিখিয়ে এসেছিল।

ইংলণ্ডে ফিরে এসে ডঃ নান মে বিজ্ঞানী মহলে সুনাম অর্জন করে এবং একজন কৃতবিদ্য বিজ্ঞানীরূপে অচিরে খ্যাতিলাভ করে। ১৯৪২ সালে সে 'টিউব অ্যালয়' প্রজেক্টে ক্যাভেণ্ডিস ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে থাকে এবং ১৯৪৩ সালের উত্তর অ্যামেরিকায় ম্যানহাটান প্রজেক্টের কাজ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে অ্যামেরিকায় পাঠান হয়। পরে তদন্তের সময় প্রকাশ পায় যে অ্যামেরিকায় পৌঁছবার অব্যবহিত পরেই একজন সোভিয়েট এজেন্টের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। আগেই তো রাশিয়ায় সিক্রেট সারভিসের খাতায় তার নাম লেখানো ছিল অতএব অসুবিধা কি?

চিকাগোর আরগোন ল্যাবরেটরিতে অ্যাটম বোমার শেষ পর্যায়ের অনেক কাজ হয়েছিল। নান মে-এর ডিউটি অন্যত্র থাকা সত্ত্বেও এই ল্যাবরেটরির প্রতি তার যেন বিশেষ আকর্ষণ ছিল এবং যে কোনো ব্রিটিশ বিজ্ঞানী অপেক্ষা নান মে এই ল্যাবরেটরিতে বেশি বার আসবার সুযোগ পেয়েছিল। নানা ছুতোয় সে এখানে আসত বলতে গেলে অ্যাটম বোমার কেন্দ্রস্থলেই সন্দেহের অতীত একজন সোভিয়েট স্পাই ছিল।

১৯৪৫ সালের মে মাসে নান মে আর একবার আরগোন ল্যাবরেটরিতে যেতে চায়, নিঃসন্দেহে মসকো থেকে কিছু জানাবার নির্দেশ এসেছিল। কিন্তু ম্যানহাটান প্রজেক্টের প্রধান প্রশাসক জেনারেল লেসলি গ্রোভস নান মে-কে ল্যাবরেটরিতে যাবার আর অনুমতি দিলেন না।

তিনি পরে বলেছেন যে, 'না, গুপ্তচর বলে তাকে আমার সন্দেহ হয় নি, আমার আপত্তি ছিল অন্য কারণে। একজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী এত বেশি সুযোগ পাবে কেন এবং আটম বোমা বিষয়ে সে এত বেশিই বা জানবে কেন।'

গ্রোভস সাহেব আপত্তি করলে হবে কি? নান মে-এর অন্য সূত্র ছিল। সে ক্যানাডার মনট্রিয়ল এবং চক রিভার প্ল্যাণ্ট থেকে অনেক গোপন তথ্য সংগ্রহ করেছিল এবং যৎসামান্য হলেও আটম বোমায় ব্যবহৃত বিশেষ ইউরেনিয়মের নমুনা সংগ্রহ করে রাশিয়ানদের হাতে দিয়েছিল।

গোপনে তদন্ত চালিয়ে নান মে সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গেল কিন্তু ব্রিটিশ এম আই ফাইভ তাকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করল না তবে কড়া নজরে রাখতে লাগল। গ্রেফতার করলে রাশিয়ান এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং সেই রাশিয়ান এজেন্টকেও ধরা যাবে না। তবে গুজেনকো এমব্যাসি থেকে পালাবার পর বোধহয় কেজিবি সতর্ক হয়েছিল। এইজন্যেই পূর্ব নির্ধারিত তারিখগুলিতে ডঃ নান মে-কে ব্রিটিশ মিউজিয়মের সামনে দেখা যায় নি। সে সময়ে সে তার বাড়িতেই বসেছিল।

গুজেনকোর ব্যাপারটা কয়েক মাস পর্যন্ত গোপন রাখা হয়েছিল। একজন রাশিয়ান সাইফার ক্লার্ক যে দূতবাসাস থেকে পালিয়ে এসে ক্যানাডায় আশ্রয় নিয়েছে এ খবর কোনো কাগজে প্রকাশিত হয় নি তবে রাশিয়ানরা বেশ বুঝতে পেরেছিল যে গুপ্তচর-চক্রের জাল এবার ছিন্নভিন্ন হবে। তারা ক্যানাডিয়ান সরকারের কাছে দাবি করছিল যে গুজেনকো-কে ফিরিয়ে দেওয়া হক কারণ সে এমবাসির তহবিল তছরুপ করেছে। মোটা টাকা নিয়ে সে পালিয়েছে।

ক্যানাডায় জাবেটিন সকল গুপ্তচরদের সতর্ক করে দিলেও সে বুঝতে পেরেছিল যে সে নিজে আর ক্যানাডায় থাকতে পারবে না। কোনদিন ক্যানাডিয়ান বা মার্কিন সিক্রেট সারভিসের লোকেরা তাকে হয়তো গুম করে দেবে।

তাই একদিন সে কাউকে কিছু না জানিয়ে চুপি চুপি নিউ ইয়র্ক বন্দর থেকে রাশিয়ান জাহাজ "আলেকজাণ্ডার সুভুরভ"-এ চেপে সরে পড়ল। বন্দর ত্যাগ করবার পূর্বে জাহাজখানিও

আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে বন্দর কর্তৃপক্ষকে কিছু জানিয়ে যায় নি।

কিছুদিন পরে শোনা গিয়েছিল যে জারেটিন নাকি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে।

ক্যানাডা, মার্কিন ও ইংরেজ সরকার স্পাই চক্রের ব্যাপারটা এতদিন চেপে রেখেছিল কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাসের ৩ তারিখে একজন রেডার ভাষ্যকার এই গোপন ব্যাপারটা রেডারে প্রকাশ করে দিল। এখন আর কিছু চেপে রাখা যায় না। প্রথমে ক্যানাডা সরকার একটি রয়েল কমিশন গঠন করল এবং তারপর প্রধান মন্ত্রী ক্যানাডা পার্লামেন্টে একটি বিবৃতি দিলেন।

প্রধান মন্ত্রী যখন পার্লামেন্টে বিবৃতি দিচ্ছিলেন ঠিক সেই সময়েই ক্যানাডা ও ইংলণ্ডে পুলিস সমস্ত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গ্রেফতার করতে আরম্ভ করল।

ডঃ নান মে-কে গ্রেফতার করা হল না কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে ব্রিটিশ অ্যাটমিক এনার্জি অথরিটির সামনে ডেকে পাঠান হল। স্পেশাল ব্রাঞ্চের কমাণ্ডার লেনার্ড বার্ট এবং আর একজন অফিসার তাকে বলল যে অ্যাটম বোমা সম্বন্ধে কিছু গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে গেছে।

তাই নাকি? আমি তো কিছুই জানি না, বলল নান মে।

লেনার্ড বার্ট তখন খোলাখুলিভাবেই বলল, কিন্তু ডক্টর তোমাকে যে সন্দেহ করা হচ্ছে, জারেটিন এবং 'বাক্সটার' ছদ্মনামধারী একজন রাশিয়ান এজেন্টের সঙ্গে তোমার যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া গেছে। তোমার কিছু বলার আছে?

নান মে প্রথমে কিছুই বলবে না এমন কি তাকে ও বাড়িতে তার কাগজপত্র সার্চ করেও কিছু পাওয়া গেল না। পুলিস তার ওপর ক্রমশঃ চাপ দিতে লাগল আসলে তো নান মে একজন বুদ্ধিজীবী এবং বিজ্ঞানী, জাত অপরাধী নয়, সে ঘাবড়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত সব স্বীকার করল।

নান মে বলল যে অনেক চিন্তা করে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলুম যে অ্যাটমিক এনার্জির তথ্যগুলিতে একা অ্যামেরিকার অধিকার থাকা উচিত নয়, এই জন্যেই আমি সোভিয়েট রাশিয়াকে কিছু তথ্য এবং ইউরেনিয়মের নমুনা সরবারহ করেছি। এবং এজন্যে আমি কোনো অর্থ নিই নি।

নান মে-কে পরে গ্রেফতার করা হল এবং ইংলণ্ডের ওলড বেলি আদালতে তার বিচার হল। শত্রুর হাতে গোপন তথ্য পাচার করার অভিযোগে তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। যদিও তার উকিল বলেছিল যে শত্রু কে? রাশিয়া তো এখনও ব্রিটেনের মিত্র। এবং উইনস্টন চার্চিল ঘোষণাও করেছিলেন যে আমাদের মিত্র রাশিয়াকে আমরা সকল রকম কারিগরি জ্ঞান সরবরাহ করব। কিন্তু বাঁচাতে পারলেন না।

কারণ ম্যানহাটান প্রজেক্টে নেবার সময় নান মে-কে শপথ নিতে হয়েছিল, যে বিষয়ে সে কাজ করবে তার কণামাত্র আভাস সে কাউকেই জানাবে না। সেই শপথ সে ভঙ্গ করে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

দশ বছরের জেল হয়ে গেল কিন্তু জেলখানায় সদব্যবহারের জন্যে সাড়ে ছয় বছর পরে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ইংলণ্ডের একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তাকে বড় চাকরি দিতে চেয়েছিল কারণ তার প্রতিভা তো সকলেই স্বীকার করে। কম্পানির শর্ত ছিল নান মে কে নাম পালটাতে হবে। নান মে রাজি হয় নি।

জীবিকা অর্জনের জন্যে প্রথমে সে সামান্য কাজ করত। পরে সে আবার গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখতে থাকে এবং বিমান সম্বন্ধে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 'মেটাল ফেটিগ' বিষয়ে গবেষণা করে। ১৯৬২ সাল থেকে নান মে ঘানা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্পেশাল প্রফেসর অফ ফিজিকসের পদে অধিষ্ঠিত। নান মে কিন্তু কোনো দিন অনুতাপ করে নি।

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। ক্যানাডায় জাবোটিনের স্পাই চক্র সম্বন্ধে রয়েল কমিশন তাদের তদন্ত শেষ করে ৭৩৩ পৃষ্ঠার রিপোর্ট পেশ করেছে। রিপোর্টও বিস্তারিত কিন্তু তবুও কিছু রহস্য রয়ে গেল।

গুজেনকোর সিক্রেট ডকুমেণ্টে চারজন স্পাইয়ের নাম পাওয়া যায় কিন্তু তাদের সনাক্ত করা যাচ্ছে না কারণ তাদের তো আসল নাম দেওয়া নেই, দেওয়া আছে কভার নেম এবং প্রত্যেক্যের নামের আদ্য অক্ষর 'জি'। যেমন।

১। 'জিনি'—একজন জু, কেমিস্ট শপের মালিক, তার একটা ল্যাবরেটরিও আছে।

২। 'গোলিয়া'—একজন যুবক, শিল্পী, জিনির আড্ডায় কাজ করে।

৩। গ্যালিয়া'—গৃহিণী, 'ডেভি-এর পাশের ফ্ল্যাটে থাকে। ডেভি হল মেজর সোলোকভ, অটোয়াতে, সোভিয়েট এমব্যাসির কমারসিয়াল অ্যাটাশে।

৪। 'গ্রীণ'—ক্যানাডিয়ান সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন। সেই সরকারী বিভাগের কোডনেম হল 'মনটরিয়ল লোকোমটিভ ডিপার্টমেণ্ট'।

আবার নতুন করে কাজ আরম্ভ হল। এই চারজনের পরিচয় বার করতে হবে। কাউণ্টার এসপিওনেজ এক্সপার্টরা ক্রমে সকলের পরিচয় বার করে ফেলল। 'গোলিয়া' একজন নবীন নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট. সে যে ল্যাবরেটরিতে কাজ করে সেখানে 'জিনি আসে। ভেভির ফ্ল্যাটের পাশে যে গ্যালিয়া থাকে তার আসল কর্মস্থল বোধহয় ইউনাইটেড স্টেটস।

বাকি দুজনের পরিচয় জানা যাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত জানা গেল ফরাসি সূত্র থেকে। 'জিনি' হল ইটালিয়ান বিজ্ঞানী ব্রুনো

পন্টিকর্ভো, ইহুদি। পন্টিকর্ভো রহস্যজনকভাবে সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ড হয়ে উধাও হয়ে যায়। অনেকের মতে, সোভিয়েট রাশিয়া যুদ্ধের পর যে সব অ্যাটমগ্রাড বা অ্যাটম নগরী তৈরি করেছিল তারই কোনো একটিতে কাজ করেছে। চীন নাকি তার সহায়তায় অ্যাটম বোমা তৈরি করেছিল।

'গোলিয়া' হল ডক্টর ক্লাউস ফুকস। জার্মান কিন্তু ব্রিটিশ নাগরিক। ফুকসকে বলা হয় গ্রেটেস্ট অ্যাটমিক স্পাই এবং পরবর্তী কাহিনীব নায়ক। এবার তাহলে ফুকসের কাহিনী আরম্ভ করা যাক।

১৯৪৩ সালেব তেসরা ডিসেম্বর। জার্মান ইউ-বোট অধ্যুষিত বিপদ সংকুল আটলান্টিক মহাসমুদ্র পার হয়ে ব্রিটিশ যাত্রীবাহী জাহাজ 'অ্যাণ্ডিস' ভার্জিনিয়ার বন্দবে ভিড়ল।

জাহাজ থেকে নামল একদল বিদেশী বিজ্ঞানী, এরা ম্যানহাটান প্রজেক্টে কাজ করবে। অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে ডঃ ক্লাউস ফুকসও এসেছে। আসলে জার্মান এবং কমিউনিস্ট তাই নাৎসীদের এবং গেস্টাপোর উৎপাতে ইংলণ্ডে পালিয়ে এসে ইংলণ্ডে বিজ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করে। প্রতিভা ছিল। অচিরে সুনাম অর্জন করে। জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হতে তাকে আটক করা হয় এবং পরে ক্যানাডায় বন্দীশিবিরে পাঠান হয়। কিন্তু যখন ম্যানহাটান প্রজেক্টের কাজ আরম্ভ হল এবং ফুকসের মতো একজন বিজ্ঞানীর প্রয়োজন হল তখন তাকে ইংলণ্ডে এনে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব দিয়ে অ্যামেরিকায় পাঠান হল। অবিশ্যি তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগও ছিল না।

আমেরিকায় ফুকসের পরিচিত বলতে একজনই আছে। সে তার বোন ক্রিষ্টেল, ম্যাসাচুসেট সে থাকে। ফুকস এই প্রথম অ্যামেরিকায় এল।

আছে, আর একজন আছে কিন্তু তাকে ফুকস আগে কখনও দেখে

নি এমন কি তার ফটোগ্রাফও দেখেনি, নামও জানে না। আব সেই লোকটিও ফুকসকে চেনে না। কিন্তু দুজনের হাতে থাকবে দুটি জিনিস, তাই দেখে তারা পরস্পরকে চিনবে।

ফুকস নিউ ইয়র্কে এসেছে। ম্যানহাটান এঞ্জিনিয়ারিং ডিস্ট্রিক্টে আপাততঃ কাজ করবে। অ্যাটম বোমা তৈরির এটি অন্যতম প্রকল্প। ফুকসকে রাখা হয়েছে বারবিজন প্লাজা হোটেলে।

কয়েক সপ্তাহ পবে ফুকস একদিন হোটেল থেকে বেরিয়ে লোয়ার ইষ্ট সাইডে এসে কার জন্যে যেন অপেক্ষা কবতে লাগল। রাস্তার এক কোণে সে দাঁড়াল। হাতে একটা টেনিস বল।

জোরে হাওয়া বইছে। পথিকেরা নিজেব নিজেব পোষাক বা মাথার টুপি সামলাতে ব্যস্ত। নিউইয়র্কেরও সব লোক ব্যস্ত। কে কাকে লক্ষ্য করছে? কার হাতে টেনিস বল কেন? কেই বা দেখছে আর কেই বা খোঁজ করছে? ফুকসেব চেহারাতেও কোনো বিশেষত্ব নেই যে কেউ নজর করবে। পাঁচজনেব ভিড়ে সে মিশে গেছে।

একজন লোক তার দিকে এগিয়ে এল। তারও চেহারা সাধারণ। মোটাসোটা গোল মুখ। লম্বায় ছ ফুটের কাছাকাছি। তার হাতে একখানা সবুজ বাঁধানো বই আর একজোড়া দস্তানা বইখানার সঙ্গে চেপে ধরা আছে।

টেনিস বল। সবুজ বাঁধানো বই ও দস্তানা হল তাদের পরস্পরকে চেনবার চিহ্ন। নীরবে ও চোখের ঈসারায় চেনাজানা হল। কোনো বাক্য বিনিময় না করে ওরা গেল থার্ড অ্যাভিনিউএ। একটা রেস্তরাঁয় ছোট একটা টেবিল নিয়ে ওরা মুখোমুখি বসল।

টেনিস বল নিজের নাম বলল ক্লাউস ফুকস।

সবুজ বই ও দস্তানা নাম বলল, 'রেমণ্ড'। তার আসল নাম যে হ্যারি গোল্ড তা সে ফুকসকে কখনও বলে নি।

ফুকস বলল যে সে ম্যানহাটান এঞ্জিনিয়ারিং ডিস্ট্রিক্টে কাজ

করছে, সেখানে অতি গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। সেখানে দারুন একটা বোমা তৈরি হচ্ছে। এমন বোমা পৃথিবীতে কখনও তৈরি হয় নি। একটা বোমাতেই একটা শহর ছারখার হয়ে যাবে। সে সব কিছু তথ্য আস্তে আস্তে জানিয়ে দেবে।

'রেমণ্ড' এমন কথা জীবনে শোনে নি। সে চোখ গোল গোল করে শুনতে লাগল।

ম্যানহাটান প্রজেক্টের চারদিকে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে

What you see here.

What you do here.

What you hear here.

When you leave your

Let it stay here.

এত সাবধানতা সত্ত্বেও অ্যাটম বোমার রহস্য ক্রমশঃ ফাঁস হতে থাকল।

হ্যারি গোল্ড একটা চিনির কারখানার কেমিস্ট। তখনও কেউ অ্যাটম বোমার নাম শোনে নি। পারমানবিক শক্তি যে কি প্রচণ্ড, কি অঘটন ঘটাতে পারে সে সম্বন্ধে সাধারণ লোকের কোনই ধারণা নেই। হ্যারি গোল্ড বিজ্ঞানের ছাত্র, বিজ্ঞান বোঝে। রহস্যময় প্রচণ্ড সেই শক্তির আভাস পেয়ে সে স্তম্ভিত।

অ্যাটম রহস্য চুরি সম্বন্ধে একটি টপ সিক্রেট মার্কা রিপোর্ট পড়তে পড়তে ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের ডিরেকটর ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায়। হুভার তখনই চোরকে খুঁজে বার করবার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ তো দিলেন কিন্তু সূত্র কোথায়? ম্যানহাটান প্রজেক্টে হাজার হাজার লোক কাজ করে। বাইরেও কত লোক আছে। তাদের মধ্যে কে চোর? তবুও অসম্ভবকে সম্ভব করতেই হবে। চোরেরা এখনও হয়তো সক্রিয়, এখনও হয়তো কিছু পাচার করছে।

ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান একদিন ঘোষণা করলেন যে রাশিয়াও অ্যাটম বোমা ফাটিয়েছে।

এফ বি আই-এর ডিটেকটিভেরা খোঁজ করতে করতে গুজেংকোর সেই কাগজপত্র থেকে দুটি পৃথক সূত্র থেকে একটি নাম পেল। নামটি হল ক্লাউস ফুকস। সন্দেহের আঙ্গুল ফুকসেই নির্দিষ্ট করে দেখাল।

যুদ্ধ শেষে ফুকস ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে বড় পদে চাকরি করছে। হারওয়েল অ্যাটমিক রিসার্চ স্টেশনে একটি বিভাগের ডিরেকটর। শীঘ্র এফ আর এস হবে এবং নোবেল প্রাইজও পেতে পারে। ফুকস ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পেয়েছে। তার বিষয়ে খোঁজ খবর ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্স বিভাগই করবে। খোঁজখবর করতে করতে দেখা গেল যে সন্দেহ অমূলক নয়।

হারওয়েলের সিকিউরিটি অফিসার বিল স্কারডন ফুকসের সঙ্গে দেখা করল। ফুকস কিন্তু সব কিছু অস্বীকার করল। তবে পরে আর একদিন স্কারডনকে ফুকস ডেকে পাঠিয়ে কিছু গালগল্প করল। নিজের জীবনের কাহিনী বলল।

স্কারডন বুঝল যে সে ঠিক লোককে পেয়েছে। সেদিন চাপ দিল না।

কয়েকদিন পরে দুজনে একসঙ্গে লাঞ্চ খেল। লাঞ্চের পরে বরফ গলতে শুরু করল। ফুকস স্বীকার করল যে ১৯৪১ সাল থেকে সে রাশিয়াকে গোপন তথ্য জানিয়ে আসছে। না, সে কোনো টাকা নেয় নি তবে রাশিয়াই তাকে একবার জোর করে একশ পাউণ্ড গছিয়ে দিয়েছিল।

ফুকস এক দীর্ঘ স্বীকারোক্তি করল। কিন্তু সে বলল যে সে কিছু অন্যায় করেনি বরঞ্চ সে তৃতীয় মহাযুদ্ধ বন্ধ করতে সাহায্য করেছে।

ফুকসকে প্রশ্ন করা হল: তুমি কাকে তথ্যগুলি দিতে? সে কে? তার নাম কি?

ফুকস কিছুই জানে না। চেহারার যে বর্ণনা দিল সে রকম চেহারা যে কোনো লোকই হতে পারে তবে লোকটা কেমিষ্ট।

কোথায় কোথায় দেখা হয়েছিল? হ্যাঁ তা বলতে পারে, নিউইয়র্কে তো কয়েকবারই, কেম্ব্রিজে একবার, সান্টো ফিতে দুবার আর যেন কোথায় মনে পড়ছে না।

বিচারে ফুকসের চোদ্দ বছর জেল হয়েছিল। মেয়াদ পূর্ণ হবার আগেই সে ছাড়া পেয়েছিল। ছাড়া পেয়ে সে ইস্ট জার্মানি চলে গিয়েছিল।

এখন সেই লোককে খুঁজে বার করতে হবে। বিভিন্ন দিক থেকে ব্যাপক তদন্ত আরম্ভ হল। লোকটা কেমিষ্ট? ১৯৪৫ সালে একা নিউইয়র্কে পঁচাত্তর হাজার কেমিক্যাল ফার্ম ছিল, তাহলে তাদের মোট কেমিস্ট নিশ্চয় একলক্ষ দাঁড়িয়ে যাবে।

তাই প্রথমে শুরু হল বিভিন্ন থানায় খোঁজ নেওয়া। যে সমস্ত কেমিস্টকে কোনোও কারণে থানায় আসতে হয়েছিল তাদের সঙ্গে অপরাধীর বর্ণনা মেলে কি না।

ফুকস যে বাড়িতে থাকত সেই বাড়ির ভাড়াটিয়ারা নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে তবুও তাদের প্রত্যেককে খুঁজে বার করে প্রশ্ন করা হল। বর্ণানুযায়ী লোকটিকে তারা দেখে নি।

ম্যানহাটান প্রজেক্টের অনেক বিজ্ঞানীকেও প্রশ্ন করা হল। তারাও সাহায্য করতে পারল না।

এফ বি আই কিন্তু হাল ছাড়ে নি। লোক বাছাই করতে করতে কুড়ি জনের ওপর সন্দেহ সীমাবদ্ধ হল এবং তাদের মধ্যে যার ওপর বিশেষ সন্দেহ হল তার নাম হ্যারি গোল্ড, ফিলাডেলফিয়াতে থাকে। একপুরুষে অ্যামেরিকান, নিউইয়র্কে যাওয়া আসা আছে।

এফ, বি আই এর কাছে হ্যারি গোল্ডের ফাইল ছিল। ফাইলে দেখা গেল ১৯৪৭ সালে কোনোও একটা ব্যাপারে কমিউনিস্টদের

ব্যাপারে খোঁজ-খবর করবার সময়ে হ্যারি গোল্ডকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল।

১৯৪০ সালে নিউ ইয়েকে একজন রুশ স্পাই ছিল, নাম জেকব গোলস।

১৯৪৭ সালের মে মাসে হ্যারি গোল্ড এফ, বি, আই-এর নজরে প্রথমে আসে। সে আর এক চক্রান্ত।

হ্যারি গোল্ডের পেশা, কেমিষ্ট। কিছু ব্লুপ্রিন্ট যাচাই করে নেবার জন্য গোলস আর একজন স্পাই মারফত হ্যারির কাছে পাঠাত। পুলিস পরে হ্যারিকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করছিল কিন্তু গোলস তখন মারা গেছে এবং প্রমাণেরও অভাব ছিল। হ্যারি গোল্ড ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল।

জুলিয়াস রোজেন বার্গ নিউ ইয়র্কের একজন এঞ্জিনিয়ার। সে এবং তার স্ত্রী ইথেল দু'জনেই কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিল কিন্তু এই তথ্যটি তারা গোপন রাখত। তাদের কাজ ছিল রাশিয়ার জন্যে স্পাই ও স্পাইচক্র তৈরি করা। স্পাইরা যে খবর সংগ্রহ করত সে খবর জুলিয়াস নিজে গ্রহণ করত না বা নিজে রাশিয়ায় পাঠাত না। সে সব পাঠাবার আলাদা ব্যবস্থা ছিল সোজা, কথায় রোজনবার্গ ছিল সোভিয়েট রাশিয়ার একজন এজেন্ট। ইথেল সব ব্যাপারে স্বামীকে সাহায্য করত।

সে নিজে এঞ্জিনিয়ার এই সূত্রে অনেক এঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানে তার পরিচিত লোক ছিল। তাদের মারফত সে নানা রকম খবর সংগ্রহ করত, কোন কারখানায় কি তৈরি হচ্ছে, কি সরবরাহ হচ্ছে ইত্যাদি। এই সব খবর রাশিয়ায় চলে যেত। এঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় চর ঢোকাবার জন্যে রোজেনবার্গ করিৎকর্মা ছোকরাদের এঞ্জিনিয়ারিং স্কুল থেকে পাস করিয়ে নিত।

রাশিয়ানরা রোজেনবার্গের কাছ থেকে অ্যামেরিকায় পারমাণবিক গবেষণার বিষয় জানতে চাইল। পারমাণবিক গবেষণা রোজেনবার্গের

এক্তিয়ারের বাইরে। এ ব্যাপারে তার কিছু জানা নেই বা ঐ প্রতিষ্ঠানে তার কোনো চর নেই।

সৌভাগ্যক্রমে একজন লোক জুটে গেল। তার নাম ডেভিড গ্রীনগ্লাস, রোজেনবর্গের ভগ্নীপতি।

গ্রীনগ্লাস একজন সুশিক্ষিত মেসিনিষ্ট। সে প্রথমে আর্মিতে ছিল। আর্মি থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে এক অস্ত্র নির্মাণের কারখানায় পাঠান হয়, সেখান থেকে ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে লস অ্যালামসের কারখানায়। এখানকার কাজটা অতিশয় গোপন।

কারখানাটা কিসের? এখানে কি তৈরি হচ্ছে তা গ্রীনগ্লাস বা কারও জানা ছিল না কিন্তু রোজেনবার্গ জেনেছিল। লস অ্যালামস কারখানায় একটি মেসিনশপের ফোরম্যান পদে নিযুক্ত হল গ্রীনগ্লস। রোজেনবার্গ ভারি খুশী।

গ্রীনগ্লাসের বয়স তখন মাত্র তেইশ; কমিউনিস্ট লিগের সে সদস্য ছিল এবং বলা বাহুল্য যে কমিউনিস্ট ভাবধারায় সে বিশ্বাসী ছিল। তাঁদের প্রতি ছিল তার গভীর সহানুভূতি।

গোপন খবরটা শুনে গ্রীনগ্লাস অবাক হল। কারখানায় কি তৈরি হচ্ছে সে না জানলেও তার বৌ রুথ জানত। রোজেনবার্গ তার বোনকে বলেছিল সম্ভবতঃ। লস অ্যালামসে তখনও বাড়ি পাওয়া যায় নি বলে রুথ তার স্বামীর কাছে আসতে পারে নি তবে মাঝে মাঝে এসে স্বামীর সঙ্গে দেখা করে যেত।

রুথ একদিন তার স্বামীকে বলল,

তুমি যেখানে কাজ করছ সেখানে কি তৈরি হচ্ছে বল তো?

জানি না তো' তুমি জান নাকি?

জানি' বৈকি, ওখানে তৈরি হচ্ছে সাংঘাতিক একটি বোমা, তার নাম নাকি অ্যাটম বোমা, একটা বোমাতেই নাকি একটা শহর উড়ে যাবে। কিন্তু খবরদার একথা তুমি কারও কাছে বোলো না তাহলে বিপদে পড়বে।

রুথকে সেদিন লস অ্যালমিসে ডেভিডের কাছে রোজেনবার্গই পাঠিয়েছিল। রুথ বলল, জুলিয়াস এখন আর কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য নেই এমন কি সে একখানা ডেলি ওয়ার্কারর কেনে না। সে এখন ও রাশিয়ায় গোপনে খবর পাঠায়। সে চায় তুমিও তোমার কারখানার কিছু কিছু খবর দাও।

প্রথমে এই প্রস্তাবে রুথ বা ডেভিড রাজি হয় নি কিন্তু তাদের বোঝানো হল যে রাশিয়া এখন অ্যামেরিকার বন্ধু, তাকে কোনো গোপন খবর দিলে অন্যায় হবে না। আরও কি বুঝিয়ে ছিল কে জানে তবে ডেভিড গ্রীণগ্লাস রোজেনবার্গের প্রস্তাবে রাজি হয়েছিল।

রোজেনবার্গ জানত সে ডেভিডকে দলে টেনে নিতে পারবে। ডেভিডের কাছ থেকে সে অনেক খবর জেনে নিল, তার মেসিনশপে কি মেসিন আছে, কি তৈরি হচ্ছে, কতজন বিজ্ঞানী আছে, কোনো ব্লুপ্রিন্ট পাওয়া যাবে কি না, কোনো চিরকূট, নানা রকম টুকিটাকি খবর।

ডেভিড একবার ছুটি নিয়ে নিউ ইয়র্কে এল। রোজেনবার্গ তার সঙ্গে দেখা করে অ্যাটম বোমার চেহারাটা কেমন হবে তার একটা বর্ণনা ডেভিডকে দিল যাতে ডেভিড একটা ধারণা করে নিতে পারে এবং খবর দেওয়ার কাজটা সহজসাধ্য নয়। অ্যাটম বোমা সম্পূর্ণ হতে তখনও সাত মাস বাকি। অ্যামেরিকা জানে না যে ইতিমধ্যে রাশিয়া অনেক কিছু জেনে গেছে।

নিউ ইয়র্কে থাকতেই ডেভিডের সঙ্গে অ্যান সিডরোভিচ নামে একজন মহিলার পরিচয় করিয়ে দিল রোজেনবার্গ। অ্যানের লস অ্যালামসে যাওয়ার কথা ছিল, আগেই পরিচয় হয়ে গেল, ভালোই হল।

অ্যান পরে যখন লস অ্যালামসে গেল তখন সে ও রুথ মাঝে মাঝে সিনেমায় যেত এবং সিনেমার অন্ধকারে এক সময় দুজনের হ্যাণ্ডব্যাগ বদলে যেত। দুজনের হ্যাণ্ডব্যাগ দেখতেও একই রকম ছিল। রুথের হ্যাণ্ডব্যাগে কিছু গোপন নকশা থাকত।

সুপরিচিত মার্কার একটা জেলির প্যাকেটের ওপরের অংশের আধখানা রোজেনবার্গ দিয়েছিল অ্যানকে আর বাকি আধখানা ডেভিডকে। এই দু'টি ছেঁড়া প্যাকেট মিলিয়ে তারা নিউ ইয়র্কে পরিচিত হয়েছিল।

আর একদিন রোজেনবার্গ একজন রাশিয়ানের সঙ্গে ডেভিডের পরিচয় করিয়ে দিল। সেই রাশিয়ান একখানা গাড়ি নিয়ে এসেছিল। ডেভিডকে গাড়িতে তুলে নিয়ে প্রায় কুড়ি মিনিট তাকে ঘুরিয়ে আনল। এই অবসরে সেই রাশিয়ান লস অ্যালামস কারখানা সম্বন্ধে ডেভিডকে অনেক প্রশ্ন করেছিল।

নিউ ইয়র্কে ছুটি শেষ হতে ডেভিড লস অ্যালামসে ফিরে গেল তবে এবার একা নয়, সঙ্গে রুথকে নিয়ে গেল।

ডেভিড গ্রীনগ্লাস খবর সংগ্রহ করে, লোক আসে, পরিচয় পত্র দেখায়, খবর নেয়, টাকা দেয়, চলে যায়।

১৯৪৫ সালের জুন মাস। একদিন একজন লোক এসে ডেভিডের ফ্ল্যাটের দরজায় নক করল। ডেভিড দরজা খুলে দিল। এ কে? একে তো ডেভিড চেনে না। অ্যান সিডরোভিচের আসবার কথা ছিল যে। পরিচয় পত্র পেশ করল আগন্তুক। নাম হ্যারি গোল্ড। ডেভিড তাকে খামে ভর্তি একটা নকশা দিল। নকশা নিয়ে গোল্ড চলে গেল।

লস অ্যালামস কারখানায় ডেভিড গ্রীনগ্লাসের চাকরি একদিন শেষ হল। তার শ্যালক রোজেনবার্গ প্রস্তাব করল যে ডেভিড চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে এঞ্জিনিয়ার হয়ে আসুক। বড় কোনো কারখানায় ঢুকতে পারলে বড় খবর পাওয়া যাবে, গ্রীন-গ্লাসেরও টাকার দরকার। কিন্তু গ্রীনগ্লাস আর পড়তে রাজি হল না। সে নিজেই একটা ছোট কারখানা করল। রোজেনবার্গও এই ব্যবসায় গ্রীনগ্লাসের সঙ্গে যোগ দিল কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও রাশিয়ানদের সঙ্গে তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হল না।

কারখানা ভাল চলল না। ডেভিড গ্রীনগ্লাস তার কারখানা তুলে দিয়ে একটা বড় এঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় চাকরি নিল। তাহলেও শ্যালক ও ভগ্নীপতির মধ্যে যোগাযোগটা রইল।

১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি। রোজেনবার্গ হঠাৎ ডেভিডের ফ্ল্যাটে এসে হাজির। তখনও ভাল করে ভোর হয় নি। রোজেনবার্গের মুখ রীতিমতো গম্ভীর।

কি ব্যাপার? এত ভোরে? ডেভিড প্রশ্ন করে,

বাইরে চল। বেড়াতে বেড়াতে বলছি

ডেভিড বাইরে এল। দুজনে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কথা হল।

ব্যাপার গুরুতর। মনে পড়ে অ্যানের বদলে একদিন তোমার কাছে অন্য একজন লোক গিয়েছিল। হ্যারি গোল্ড? মনে পড়ছে?

হ্যাঁ, মনে পড়ছে। সে কিছু করছে নাকি?

সে ক্লাউস ফুকস নামে একজন বিজ্ঞানীর সঙ্গে যোগাযোগ করত। সেই ফুকস ইংলণ্ডে ধরা পড়েছে। এইবার হ্যারি গোল্ডের পালা। যতদূর জানি হ্যারি এখনও ধরা পড়েনি কিন্তু হ্যারি ধরা পড়লে জেনে রাখ এফ বি আই তোমার কাছে আসবে অতএব তুমি এখনই পালাও।

হঠাৎ আমি পালাব কি করে? মেলা টাকার দরকার। অন্য অসুবিধে আছে। ডেভিড বলল।

টাকার চিন্তা নেই, রাশিয়ানরা দেবে। তুমি পালাবার সব ব্যবস্থা কর।

কিন্তু এদিকে রুথ যে প্রেগন্যান্ট। শীগগির তার বাচ্চা হবে। কি করে রুথকে ছেড়ে যাই। তুমি বরঞ্চ হ্যারি গোল্ডের পালাবার ব্যবস্থা কর।

অগত্যা রোজেনবার্গ ডেভিডের প্রস্তাবে রাজি হয়ে চলে গেল কিন্তু হ্যারি গোল্ডের পালাবার ব্যবস্থাও করা গেল না।

২২ মে তারিখে রোজেনবার্গ হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এল।

রীতিমতো উত্তেজিত। হাতে একখানা নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন। উত্তেজিত হবার কারণ হল যে প্রথম পাতাতেই হ্যারি গোল্ডের ছবি ছাপা হয়েছে। মাত্র একটি কারণের জন্যেই হ্যারি গোল্ডের ছবি ছাপা হতে পারে। সে ধরা পড়েছে।

ডেভিডকে রোজেনবার্গ বলল, আর এক মিনিটও দেরি নয়, এখনি পালাও। দেখলে তো হ্যারি গোল্ড ধরা পড়েছে। তৈরি হয়ে নাও, আপাততঃ এই একহাজার ডলার রাখ। পরে আরও দোব। তোমাব পালাবাব ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। তাছাড়া আমি নিজেও শীগগির পালাব।

নতুন শিশুটিকে নিয়ে মাত্র আগের দিন রুথ হাসপাতাল থেকে ফিরেছে। ডেভিড দ্বিধায় পড়লেও দেশত্যাগ করতে রাজি হল। সে কি ভাবে ট্যুরিষ্ট পাসপোর্ট নিয়ে মেকসিকোয় যাবে এবং সেখানে গিয়ে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করে 'আই জ্যাকসন' বলে নিজেব পরিচয় দেবে তাহলে রাষ্ট্রদূত তৎক্ষণাৎ তার ইউরোপ যাবার ব্যবস্থা কবে দেবে, রোজেনবার্গ এই সব আয়োজন সম্পূর্ণ করে এসেছে।

ডেভিড গ্রীনগ্লাস ট্যুরিষ্ট পাসপোর্ট করিয়ে নিল। রোজেনবার্গ আরও চাব হাজার ডলার দিয়ে গেল। অতটাকা ডেভিড নিজের কাছে রাখতে সাহস করল না। এক বন্ধুর কাছে গচ্ছিত রাখল। ভাগ্যিস রেখেছিল তাই তার মামলার সময় টাকাটা কাজে লেগেছিল।

সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করেও শেষ পর্যন্ত আর পালাতে হল না।

গ্রীনগ্লাস তখন নিউইয়র্কে একটা ফ্ল্যাটে বৌকে নিয়ে বাস করছিল। সে তার স্ত্রী ও শিশুর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত।

সেদিন সকালে যে যখন তার বাচ্চার জন্যে দুধ তৈরি করছিল সেই সময়ে দরজায় কেউ নক করল। গ্রীনগ্লাস উঠে এসে দরজা খুলে

দিল। বাইরে যে দুজন লোক দাঁড়িয়েছিল তাদের দেখেই ডেভিড গ্রীনগ্লাসের বুক ঢিব ঢিব করতে লাগল। যদিও তারা অপরিচিত তবুও তাদের চেহারা বলে দিচ্ছে ওরা কারা।

একজন জিজ্ঞাসা করল : মিঃ গ্রীনগ্লাস ? ডেভিড গ্রীনগ্লাস ?

হ্যাঁ আমার নাম ?

ভেতরে আসতে পারি ?

আসুন

তারা দুজনে ভেতরে ঢুকল। এবার তাবা পরিচয় দিল। এফ বি আই থেকে আসছি। লস অ্যালামস থেকে কিছু নকশা গোপনে পাচার হয়েছে। তুমি তো সেখানে ফোরম্যান ছিলে। কিছু বলতে পার ?

লস অ্যালামসে কাজ করতুম ঠিকই তবে যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছ সে বিষয়ে আমি কিছু বলতে পাবব না। আমি কিছুই জানি না।

ডেভিডকে আরও প্রশ্ন করা হল কিন্তু ডেভিড সবই অস্বীকাব করল তারা ডেভিডেব একখানা ফটো নিয়ে চলে গেল।

ওদিকে তখন হ্যারি ও গোল্ডকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। নানা-রকম জেরা করা হচ্ছে। হ্যারি ধবা পড়ে যাবার পর থেকে আব কিছুই লুকোচ্ছে না। যা জানে সবই বলে দিচ্ছে। হ্যারিকে ডেভিড গ্রীনগ্লাসের ফটোখানা দেখান হল। হ্যাবি গোল্ড চিনতে পাবল। বলল এর নাম ডেভিড গ্রীনগ্লাস।

এর সঙ্গে তোমার কোথায় দেখা হত ? এফ বি আই-এর লোকেরা জিজ্ঞাসা করল।

আমাব সঙ্গে একবাবই দেখা হয়েছিল। অ্যালবুকর্কে আমি ওর বাসায় গিয়েছিলুম। আমার সঙ্গে ছিল একটা জেলির আধখানা প্যাকেট। বাকি আধখানা ছিল ওর কাছে। আমার পাসওয়ার্ড ছিল 'আই কাম ফ্রম জুলিয়াস।'

তোমাকে কে পাঠিয়েছিল ?

জন।

জন কে ?

আমি জানি না।

ডেভিড গ্রীনগ্লাস পরে ধরা পড়েছিল। তার বিচার হয়েছিল। শাস্তি হয়েছিল পনেরো বছর জেল।

ফুকসের সেই লোকটিও কেমিষ্ট। হ্যারি গোল্ডও কেমিষ্ট এবং সরাসরি না হলেও গোলস নামে একজন রুশ স্পাইয়ের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়েছিল।

হ্যারি গোল্ডকে খুঁজে বার করতে এফ বি আইকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছিল। এফ বি আই অনেক আশা নিয়ে গোল্ডের একখানা ফটো ইংলণ্ডে ফুকসের কাছে পাঠাল। চোখ ছোট বড়করে ভুরু কুঁচকে ছবিখানা একবার কাছে এনে একবার দূরে সরিয়ে দেখে ফুকস রায় দিল

না, এ লোক নয়

এফ বি আই এত সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। তারা ভাবল ফুকস নিজে তো ধরা পড়েছে তবে আর একজনকে কেন ধরিয়ে দেয় ? এজন্যে স্বীকার করল না।

যে লোক মারফৎ গোলস ব্লুপ্রিণ্ট পাঠাত তাকে এফ বি আই খুঁজে বার করল। তারপর হ্যারি গোল্ডের সমেত আরও কয়েকজনের ফটো দিয়ে জিজ্ঞাসা করল : বলতো এদের মধ্যে কাকে তুমি ব্লুপ্রিণ্ট দিয়ে আসতে ?

লোকটি হ্যারি গোল্ডের ফটোখানা তুলে নিল।

এবার আর ফটো নয়। এফ বি আই হ্যারি গোল্ডের অজানতে তার ওঠা বসা চলাফেরার সিনেমা ফিল্ম তুলে নিয়েছে। সেই ফিল্ম ফুকসের কাছে পাঠান হল।

হ্যারি গোল্ড কি করে ধরা পড়ল ?

হ্যারি গোল্ড তখন ফিলাডেলফিয়া জেনারেল হাসপাতালে চাকরি করছে। এফ, বি, আই-এর দুজন স্পেশাল এজেন্ট একদিন গোল্ডের সঙ্গে দেখা করতে হাসপাতালে এল।

নিজের ওপব গোল্ডেব খুব বিশ্বাস। কয়েকটা মামুলী প্রশ্নেব পর তাকে ফুকসের একটা ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা হল।

একে তুমি চেন?

ও তো সেই ইংলিস স্পাই

কি করে চিনলে?

কেন? ওর ছবি তো খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে

ছাপা হয়েছে ঠিক কিন্তু এই ছবিখানা ছাপা হয় নি তো। যাক তুমি একে কখনও চিনতে?

না, আমার সঙ্গে পরিচয় হয় নি।

এফ, বি, আই,-এর এজেন্টরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হ্যারি গোল্ডের মুখের প্রতিটি ভাব লক্ষ্য করছে।

তারা আবার প্রশ্ন করল: তুমি কি হালে সাণ্টা ফি গিয়েছিলে?

হালে কেন? কোনো দিনই সে পশ্চিমে অতদূর যায় নি।

প্রশ্নগুলি খুবই ইঙ্গিতস্পূর্ণ কাবণ ফুকসেব সেই কেমিস্ট অন্ততঃ দুবার সাণ্টা ফি গিয়েছিল।

হ্যারি গোল্ড মনে মনে নিজেকে বিপন্ন বোধ করল কিন্তু এফ, বি, আই তাকে কায়দায় আনতে পারছে না।

সেদিন এফ বি আই-এর এজেন্টরা ফিরে গেল।

কয়েদিন পরে তারা আবার গোল্ডের বাড়িতে এসে হাজির। তারা বলল:

তোমার বাড়িটা একটু খুঁজে দেখতে চাই, আপত্তি আছে?

না, আপত্তি কিসের? স্বচ্ছন্দে তোমরা আমার বেডরুম থেকেই আরম্ভ কর কারণ ঐ ঘবেই আমার বই আর কাগজপত্র, চিঠি সব থাকে।

যখনি কোনো বিষয়ে গোল্ডকে প্রশ্ন করা হয়, প্রত্যেকটির জন্যেই তার সন্তোষজনক জবাব তৈরি।

এজেন্টরা ঘর সার্চ করতে করতে হঠাৎ বুক কেসে বইয়ের পেছন থেকে একজন এজেন্ট খামে ভরা কি একটা টেনে বার করল। খামের ওপর লেখা আছে 'সান্টা ফি ক্যাপিটাল সিটি'। ভেতরে ভাঁজ করা এখানা ম্যাপ।

সান্টা ফি শহরে ফুকসের সঙ্গে হ্যারির এক জায়গায় দেখা করার কথা ছিল। সেই জায়গাটা হ্যারির জানা ছিল না। তাই শহরে পৌঁছে একটা বুকস্টল থেকে সে ম্যাপখানা কিনেছিল এবং পরে পকেটে করে বাড়ি এনে বুককেসে রেখে দিয়ে ম্যাপের কথা ভুলেই গিয়েছিল।

এখন সেই ম্যাপ দেখে হ্যারি গোল্ডের মুখ শুকিয়ে গেল। গোল্ডের ভাবান্তর এজেন্টদের দৃষ্টি এড়াল না।

সেই এজেন্ট জিজ্ঞাসা করল: তুমি যে বলেছিল পশ্চিম অতদূর তুমি যাও নি, সান্টা ফি গিয়েছিলে নাকি? ম্যাপখানা কোথা থেকে এল? সান্টা ফি গিয়েছিলে নাকি?

আমাকে একটা সিগারেট দাও তো।

একজন এজেন্ট একটা সিগারেট দিল কিন্তু তারা লক্ষ্য করল যে সিগারেট ধরাবার সময় হ্যারি গোল্ডের হাত কাঁপছে।

সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়ে সে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। সে হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ল। শরীর ও মনের ওপর নিরন্তর স্নায়বিক চাপ সে আর সহ্য করতে পারছিল না। সে হঠাৎ বলল:

হ্যাঁ, আমিই সেই লোক। ফুকসের কাগজপত্র আমার হাত দিয়েই গোপনে পাচার হয়েছে।

হ্যারি গোল্ডের এই স্বীকারোক্তির সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ দিনের অনুসন্ধান শেষ হল। শূন্য থেকে আরম্ভ হয়েছিল এবার বাস্তব একটা পূর্ণচ্ছেদে তার সমাপ্তি ঘটল।

এই সময়ে ইংলণ্ড থেকে ওয়ারলেস মেসেজ এল। ফুকস এবার ভুল করে নি, সে হ্যারি গোল্ডকে চিনতে পেরেছে।

সোভিয়েট রাশিয়া ইতিমধ্যে হ্যারি গোল্ডকে 'অর্ডার অফ দি রেডস্টার' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। এই উপাধিকারীদের মসকো শহরে বাসে চড়লে ভাড়া দিতে হয় না। হ্যারি গোল্ড সে সুযোগ নিতে পারে নি। বিচারে তার তিরিশ বছর কারাদণ্ড হয়ে গেল।

১৯৪৫ সালের মে মাসের গোড়ায় জার্মানি বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করল। জাপানের অবস্থা তখন বেশ খারাপ, সঙ্গীন বা শোচনীয় বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। মার্কিন সৈন্যরা জাপানের খুব কাছে ওকিনওআ দ্বীপে নেমে পড়েছে। জাপানের বড় বড় শহরে সুপার-ফর্ট্রেস বিমান থেকে ঘন ঘন বোমা পড়ছে, একের পর এক যুদ্ধ জাহাজ ধ্বংস হচ্ছে, নতুন জাহাজ আর তৈরি করাও যাচ্ছে না। জাপানে এক দল লোক বুঝল পরাজয় অনিবার্য তবে আর যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সার্থকতা কি? মিছামিছি লোকক্ষয়, অর্থক্ষয় আর সেই সঙ্গে শহর বন্দর আব কলকারখানা ধ্বংস। জাতির মনোবল আর মেরুদণ্ড ভেঙে যেতে দেরি নেই।

রাশিয়া জার্মানির সঙ্গে লড়াই করছে, জাপান জার্মানির দলে কিন্তু রাশিয়া তখনও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি। জাপানের এই শান্তিবাদী দল যুদ্ধ থামাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এই শান্তিবাদী দলের পক্ষে জাপানের মিকাডো অর্থাৎ সম্রাটের

পুরো সমর্থন ছিল। শান্তিবাদীরা স্থির করল যে সোভিয়েট রাশিয়ার মাধ্যমে মিত্রশক্তির কাছে শান্তির প্রস্তাব পেশ করবে।

জাপানে অপরপক্ষে ছিল যুদ্ধবাদীর দল যাদের নেতা ছিল স্বয়ং যুদ্ধমন্ত্রী জেনারেল কোরেচিকা আনামি।

আনামি বলল: না, এ হতে পারে না, জাপান আত্মসমর্পণ করবে না। ওকিনওআ থেকে মার্কিন সৈন্যদের জাপান শীঘ্রই হটিয়ে দেবে। জাপানের হাতে এখনও যে পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র গোলাগুলি, বিমান আর রসদ মজুদ আছে তার সাহায্যে আমেরিকাকে প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে হটিয়ে দেওয়া মোটেই কঠিন হবে না। পরাজয় স্বীকার করবার জন্যে জাপান যুদ্ধে নামে নি।

শান্তিবাদীরা জানত যে জাপানের হাতে গোলাগুলি যতই মজুদ থাকুক না কেন তার বিরাট নৌবাহিনী বিধ্বস্ত এবং যে কয়েকখানা জাহাজ ও সাবমেরিন, আকাশে বিমান এবং ডাঙায় ট্যাংক ও মোটর যান অবশিষ্ট আছে সেগুলি চালাবার মতো পেট্রল নেই। শান্তিবাদী আর যুদ্ধবাদী, এই দুই দলের মতামত যাই হক না কেন শেষ পর্যন্ত একটি মাত্র শব্দের ভুল অর্থ করার জন্য জাপানের সর্বনাশ হয়ে গেল। তার দুটো শহরে অ্যাটম বোমা পড়ল। সেই শব্দটির সঠিক অর্থ করতে পারলে হয়ত জাপান আরও উদার শর্তে আত্মসমর্পণ করা সুযোগ পেত, অ্যাটম বোমা ফেলে অ্যামেরিকাকে চরম নিষ্ঠুরতার বিশেষণে ভূষিত হতে হত না।

জাপানে তখন সোভিয়েট রাশিয়ার অ্যামবাসাডর ছিলেন ঝানু কূটনীতিক জেকব মালিক। শান্তিবাদীরা প্রাথমিক আলোচনার জন্যে কোকি হিরোতাকে পাঠাল জেকব মালিকের কাছে। হিরোতা জাপানের একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। জেকব মালিক কিন্তু হিরোতাকে আমল দিলেন না। শান্তি প্রস্তাব তোলবার অবকাশ পেল না হিরোতা। এ হল ঐ বছরের তেসরা জুনের ঘটনা।

অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে লাগল। সম্রাট স্বয়ং হস্তক্ষেপ

করলেন। তিনি এক ব্যক্তিগত বার্তা দিয়ে প্রিন্স কনওয়েকে পাঠালেন মস্কোতে। সম্রাট তাকে নির্দেশ দিলেন, যে কোনো উপায়েই হোক কনোয়ে যেন যুদ্ধ বন্ধ করবার চেষ্টা করে।

কনোয়ের দৌত্যও ব্যর্থ হল।

সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী মলোটভ এবং স্বয়ং স্ট্যালিন জাপানের পক্ষ নিতে রাজি হলেন না, তাঁরা বললেন যে তাঁরা এখন আসন্ন পটসডাম কনফারেন্স নিয়ে ব্যস্ত আছেন, সেখানে জার্মানির আত্মসমর্পণ নিয়ে এবং জার্মানিকে কিভাবে শাসন করা হবে এসব ব্যাপার নিয়ে তাঁরা ব্যস্ত আছেন। কনফারেন্সে প্রেসিডেন্ট ট্রুমান উইনস্টন চার্চিল আসছেন। স্ট্যালিনও যাবেন।

অথচ এই পটসডাম কনফারেন্সে অন্যান্য আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে জাপানের ভাগ্য আলোচিত হওয়ারও প্রস্তাব ছিল। জাপান বুঝল আজ সে একা। সম্পূর্ণ একা। তার পক্ষে একটাও দেশ নেই। সে একদিন সাদা এশিয়াতে 'নিউ অর্ডার' চালাবার চেষ্টা করেছিল। তার মতবাদ চাপাতে চেয়েছিল সারা এশিয়ার ওপর। সেদিন সে ছিল মদগর্বে গঠিত। যুদ্ধে প্রাথমিক সাফল্য লাভ কনলেও শেষ রক্ষা করতে পরেল না জাপান।

উইলস্টন চার্চিল এবং প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এসেছিলেন পটসডার। স্ট্যালিনও গিয়েছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে স্ট্যালিন জাপানের প্রস্তাব ট্রুম্যানের কানে তুলেছিলেন মাত্র। প্রস্তাবটা আলোচনার যোগ্য বলেও তিনি বা ট্রুম্যান মনে করেন নি। স্ট্যালিন বলেছিলেন: ওদের প্রস্তাব কিছুটা আগ্রহ হয়ত ছিল কিন্তু ওদের বিশ্বাস করা যায় না।

কথাটা উঠেই থেমে গিয়েছিল আর এগোয় নি।

তবে কনফারেন্সে ঠিক হল যে জাপানকে একটা চরমপত্র দেওয়া হক। এই চরমপত্রে স্বাক্ষর দিল ব্রিটেন, অ্যামেরিকা ও চীন। জাপান যা আশংকা করেছিল এ শর্ত তার চেয়ে অনেক উদার

প্রথম শর্ত ছিল জাপানকে শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে

তা না করলে তাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা হবে আর জাপান যদি আত্মসমর্পণ করে তাহলে অবশ্য জাপান তার সম্রাটের অধীনে যেমন আছে তেমন থাকবে আর জাতি হিসেবেও তাকে স্বীকার করা হবে। আগে সারেণ্ডার তারপর খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

পটসডাম কনফারেন্সের এই রিপোর্ট পেয়ে জাপানীরা এবং স্বয়ং সম্রাট স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য মনে হল। পররাষ্ট্রমন্ত্রী টোগোকে সম্রাট বললেন: পটাসডাম কনফারেন্সের প্রস্তাব গ্রহণ করা যেতে পারে।

২৭ জুলাই তারিখে জাপানের মন্ত্রীসভার বৈঠক বসল। যুদ্ধমন্ত্রী আনামি ছাড়া সকলেই যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে মত দিলেন।

দু' একটা প্রশ্ন উঠল।

জাপান মস্কোর মারফত কয়েকটা প্রস্তাব পেশ করেছিল মিত্র-শক্তির কাছে। তারই বা কি হবে? জবাবের জন্যে কি অপেক্ষা করা হবে? তাছাড়া আর একটা প্রধান প্রশ্ন, জাপান ত সরকারীভাবে তখনও পটসডাম কনফারেন্সের চরম পত্র পায় নি, তারা রেডিও মারফত খবরটা শুনেছে মাত্র।

রেডিও সংবাদকে ভিত্তি করে ত আর অগ্রসর হওয়া যায় না। তথাপি অনুমান করা গেল যে মিত্রশক্তির চরম প্রস্তাব অচিরেই পাওয়া যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণ করে মিত্রপক্ষকে সরকারীভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে।

কর্মচঞ্চল সাংবাদিকরা স্বভাবতই আরও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। নানারকম জল্পনাকল্পনা। জাপান কি করবে? এই সংবাদ যে আগে বার করতে সে ত দারুণ একটা স্কুপ করবে; এই নিয়ে সাংবাদিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে। মন্ত্রীরা অতি কষ্টে তাদের ঠেকিয়ে রেখেছেন।

পরদিন প্রধানমন্ত্রীর প্রেস কনফারেন্স। সাংবাদিকরা স্বভাবতই সেই প্রশ্নই করবে, জাপান কি সারেণ্ডার করবে? নাকি যুদ্ধ চলবে?

রুদ্ধদ্বারে মন্ত্রীসভার বৈঠক চলল। বৈঠকে ঠিক করা হল যে সাংবাদিকরা বৈঠকের ফলাফল সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে বলা হবে যে মন্ত্রী-সভা এখনও কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে নি।

পরদিন ২৮ জুলাই। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস কনফারেন্স। উদগ্রীব দেশবাসীরা স্বভাবতই প্রশ্ন করল জাপান কি করবে? শান্তি প্রস্তাব মেনে নেবে না কি যুদ্ধ চালিয়ে যাবে?

প্রধানমন্ত্রী সুজুকি উত্তর দিল যে সরকার 'মকুসাভসু' নীতি গ্রহণ করেছেন।

সুজুকির মুখ দিয়ে 'মকুসাভসু' এই কথাটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাপানের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল। সামান্য একটি কথার কী গভীর অর্থই না হতে পারে এবং তা কী সর্বনাশ করতে পারে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সুজুকির মুখ নিঃসৃত ঐ একটি কথা।

দুঃখের বিষয় শব্দটির ইংরেজি কোনো প্রতিশব্দ নেই, জাপানী ভাষাতে এর দু'রকম অর্থ হয়। এক অর্থ 'কোনো মন্তব্য করা হবে না' অপর অর্থ 'নাকচ' করা।

যুদ্ধের সংকটপূর্ণ উত্তেজনার সময় অত ভেবেচিন্তে কথা বলবার সময় কোথায়?

জাপানের ডোমেই নিউজ এজেন্সির কর্মীদেরও একই অবস্থা। তারাও জাপানের সংকটপূর্ণ অবস্থায় মানসিক চাপে ভুগছে। সুজুকির মন্তব্য অনুবাদ করবার সময় ব্যাপারটা তারা তলিয়ে দেখে নি, সুজুকি কি বলতে চেয়েছেন এবং সেই একটি মাত্র কথার গুরুত্ব কতখানি তার সঠিক অর্থ না হলে পরিণতি কি হতে পারে তা তারাও ভাল করে ভেবে দেখে নি। তাহলে তারা হয়ত সুজুকি একবার ফোন করে কথাটার অর্থ স্পষ্ট করে নিত। সুজুকি আসলে কি বলতে চাইছে তা তারা যাচাই করে নিত।

সংবাদটি বিদেশে দ্রুত প্রচার করবার জন্যে ডোমেই নিউজ এজেন্সি দুর্ভাগ্যক্রমে মারাত্মক অর্থটাই করল। রেডিও টোকিয়ো

থেকে ডোমেই নিউজ এজেন্সি পরিবেশিত সংবাদ পরিবেশিত হল "জাপান পটসডাম চরমপত্র নাকচ করেছে"। সর্বনাশের আর কিছু বাকি রইল না।

পর দিনই নিউ ইয়র্ক টাইমস মস্ত বড় হেডলাইন ছাপল "টোকিয়ো পটসডাম চুক্তি নাকচ করার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন নৌ-বাহিনী আক্রমণ শুরু করেছে।

এবার প্রশ্ন হতে পারে, জাপান এমন মারাত্মক ভুলের প্রতিবাদ করল না কেন? কেন করল না সে কথা বলা শক্ত। যুদ্ধবাদীর দল সারা জাপানে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেছে। একের পর এক জাহাজ ডুবছে, একের পর এক কারখানা ধ্বংস হচ্ছে আর যুদ্ধমন্ত্রী যেন মরিয়া হয়ে উঠছেন।

যুদ্ধবাদীরা বেপরোয়াভাবে ধরপাকড় আরম্ভ করে দিল এমন কি তাদের দৃষ্টিতে অবাঞ্ছিত শান্তিবাদীদের গুলি করে হত্যা করতেও তারা কুণ্ঠিত হল না। কত মানুষ যে হায়াকিরি করল তার কোনো হিসেব পাওয়া যায় না।

সেই প্রবল জোয়ারের মুখে কেউ হয়ত প্রতিবাদ করে থাকবে কিংবা প্রাণভয়ে সাহস করে তাও করে নি।

সামান্য কথাটির সেই ভুল অর্থের মূল্য জাপান আজও শোধ করতে পারে নি। মার্কিনরা আজও তার বুকের ওপর চেপে বসে আছে।

সেই পরিস্থিতিতে মিত্রশক্তি কি করছে?

১৬ জুলাই ১৯৪৫।

বার্লিনে দু'নম্বর কাইজার স্ট্রাসের একখানা বাড়িতে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান বসে আছেন। খবরটা সেইদিনই তিনি পাকাপাকি ভাবে পেয়েছেন। অ্যামেরিকায় নিউ মেকসিকোর মরুপ্রান্তরে অ্যাটম বোমার পরীক্ষা সফল হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে, আর হয়ত তিন চার মাসের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হবে কিন্তু এই তিন চার মাসের মধ্যেই কত শত লোক মরবে, কত শহর, বন্দর ধ্বংস হবে তো কে বলতে পারে ?

একটি চরম অস্ত্ররূপে অ্যাটম বোমা তৈরি করা হয়েছে। এর জন্যে মার্কিনীরা কয়েক কোটি ডলার খরচ করেছে, এসব কি ব্যর্থ হবে ? কিন্তু অ্যাটম বোমা যদি প্রয়োগ করা হয় ?

পরামর্শ যারাই দিক, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকেই নিতে হবে। জাপানেব ওপব অ্যাটম বোমা ফেললে জাপান অবিলম্বে সারেণ্ডার করতে বাধ্য হবে ফলে অনেক মার্কিন সন্তানের প্রাণ বাঁচবে। মার্কিন ডলারও বাঁচবে কোটি কোটি।

হাজার হাজার জাপানী মরবে ঠিকই কিন্তু যুদ্ধ চললে ? দুই পক্ষেরই কত হাজার সৈন্য মরবে তা কে বলতে পারে ? এ ছাড়া আরও একটি প্রধান কারণ ছিল। জাপানের ওপর অ্যাটম বোমা ফেলার প্রধান যুক্তিই সেই কারণটি। তা নইলে মরা-জাপানের ওপর খাঁড়ার ঘা মারা হবে কেন ? নিশ্চয়ই একটা কারণ ছিল। সেই কারণটা কি ?

জাপানের ওপর অ্যাটম বোমা ফেলা হবে, এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হ্যারি এস ট্রুম্যানের নেবার কথা নয়। অ্যাটম বোমা তৈরির প্রকল্প যিনি শুরু করেছিলেন সেই রুজভেল্টই হঠাৎ মারা গেলেন, নইলে ট্রুম্যান ত প্রেসিডেন্ট হবার কথা নয়। ট্রুম্যান একদা মনে মনে বহু আশা পোষণ করতেন যে তিনি পিয়ানো-বাদক হবেন। বাড়িতে বসে টুং টাং করে পিয়ানো বাজাবেন, নতুন নতুন সুর রচনা করবেন, সঙ্গীতের স্বর্গপুরে বাস করবেন।

রুজভেল্ট যখন প্রেসিডেন্ট, ট্রুম্যান তখন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে রুজভেল্টের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল মাত্র আটবার আর নিভৃতে রাজনীতি বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল মাত্র দু'বার। এমন কি অ্যাটম বোমা যে তৈরি হচ্ছে সেই খবরটাই ট্রুম্যান

ভাসা ভাসা শুনেছিলেন। বৃদ্ধ সময় মন্ত্রী হেনরি স্টিমসন তাঁকে স্পষ্টই বলে দিয়েছিলেন, "ম্যানহাটান প্রজেক্টটা কি, সে বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না তবে ওর মধ্যে আপনি না ঢুকলেই আমরা খুশি হব"!

অ্যাটম বোমার বিষয়ে ট্রুম্যান যখন দ্বিতীয়বার শুনলেন তখন তিনি প্রেসিডেন্ট। প্রথব ক্যাবিনেট মিটিং এর পরই সেই বৃদ্ধ সময় মন্ত্রী স্টিমসনই তাঁকে ম্যানহাটান প্রজেক্টের বিষয় জানিয়ে দিলেন। যে বোমাটি তৈরি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এল সেটি যদি সফল হয় তাহলে পৃথিবী উড়িয়ে দিতে পারা যাবে।

অ্যাটম বোমা চরম রূপ নিতে তখন আর তিন মাস মাত্র বাকি। রাশিয়া আর অ্যামেরিকা দু'দিক থেকে জার্মানির ভেতরে ঢুকে পড়েছে এবং দুই দেশের সৈন্যবাহিনী দ্রুত বেগে বার্লিনের দিকে ধাবমান। বার্লিনে কে আগে পৌঁছতে পারে? দুই রাত্রের মধ্যে শুধুই বার্লিনে আগে পৌঁছবার প্রতিযোগিতা শুরু হল না, ইউরোপ, চীন, জাপান এবং দূর প্রাচ্যে প্রাধান্য লাভের জন্যে শক্তির প্রতিযোগিতাও আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল ভেতরে ভেতরে।

৮ মে জার্মানি বিনা শর্তে আত্মসমর্পন করল।

বার্লিনের কাছে পটসডামে তিন প্রধান, চার্চিল, স্ট্যালিন এবং ট্রুম্যান মিলিত হলেন; ইউরোপ কি ভাবে ভাগ করা হবে তাই ঠিক করতে এবং জাপানের ভাগ্য নির্ধারিত করতে।

তিন প্রধান যখন যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত শ্মশান স্বরূপ জার্মানিতে বসে শান্তি শান্তি বলে চিৎকার করছেন ঠিক সেই সময়ে প্রথম অ্যাটম বোমা ফাটল অ্যামেরিকায়। খবরটা সঙ্গে সঙ্গে জার্মানিতে ট্রুম্যানকে জানান হল, ট্রুম্যান জানালেন চার্চিলকে। স্ট্যালিনকেও ও জানান দরকার।

২৪ জুলাই তারিখে কনফারেনন্সের পর কথা প্রসঙ্গে ট্রুম্যান স্ট্যালিনকে খবরটা জানালেন। বললেন আমরা নতুন ধরনের একটা

বোমা তৈরি করেছি। কিন্তু সেই বোমা কি ভীষণ তার শক্তি কি প্রচণ্ড, তার ফলাফল কি ভীষণ, সে কথাটা বললেন না।

স্ট্যালিন উত্তরে বললেন : বেশত, তাহলে সেই বোমার সদ্ব্যবহার জাপানের ওপরই হক।

জাপানের তখন অন্তিম অবস্থা, তবুও জাপান লড়ে যাবে। জাপানের যুদ্ধবাদীরা তখন বেপরোয়া। সবই যখন গেছে তখন শেষ পর্যন্ত দেখে মরাই ভাল, নাকি তাদেরও হাতে কোনো গোপন অস্ত্র বা প্ল্যান ছিল? স্মরণীয় সেই ২৭ জুলাই। ট্রুম্যান, চার্চিল এবং চিয়াং কাইসেক রেডিও মারফত জাপানকে আত্মসমর্পণ করতে বললেন। পরদিন মারাত্মক সেই 'মকুসাৎসু' ভুল শব্দের জন্য মিত্রশক্তি রেডিও মারফত জানল যে জাপান আত্মসমর্পণ করছে না। মিত্র-শক্তির শেষ প্রস্তাব তারা নাকচ করেছে। জাপান আত্মসমর্পণ করবে না। মিত্রশক্তিই বা তাদের চরম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জাপানের কাছে সরকারীভাবে এবং লিখিত কোনো চরমপত্র পাঠায় নি কেন? এ প্রশ্নের কোনো জবাব নেই। সবই যেন অস্পষ্ট।

এইবার সেই চরম সিদ্ধান্ত নিতে হবে আর সিদ্ধান্ত পারে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি স্বয়ং, আর কেউ নয়। সেই সিদ্ধান্তের জন্যে দায়ী থাকবেন একা হ্যারি এস ট্রুম্যান।

ট্রুম্যানের সামনে তখম বিচার বিষয়।

অ্যাটম বোমা ফেললে যুদ্ধ এখনই থেমে যাবে, কয়েক লক্ষ মার্কিন ও ব্রিটিশ সৈন্যের প্রাণ বাঁচবে এবং পৃথিবীকে বিশেষ করে রাশিয়াকে জানান হবে যে অ্যামেরিকা আজ মারাত্মক এক অস্ত্রের অধিকারী। চার্চিল অবিশ্যি অ্যাটম বোমা ফেলার পরামর্শ অনেক আগেই দিয়ে-ছিলেন। এখন সমর মন্ত্রী স্টিমসনও সেই পরামর্শ দিলেন। ট্রুম্যানও পরামর্শ গ্রহণ করলেন। যুদ্ধের অন্যতম অস্ত্র হিসেবেই তিনি অ্যাটম বোমাকে মেনে নিলেন।

উত্তর জীবনে ট্রুম্যান আফশোষ করেন নি। বহুবার তাঁকে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে, প্রতিবারই তিনি বলেছেন এটিকে আমি যুদ্ধের আর একটি অস্ত্র বলেই ধরে নিয়ে ছিলুম।

প্রথমে কোথায় অ্যাটম বোমা ফেলা হবে? জাপানের চারটে শহর বেছে নেওয়া হল, হিরোশিমা, কোকুরা, নাগাসাকি আর নিগাতা। বিমান থেকে জাপানী ভাষায় লক্ষ লক্ষ প্রচারপত্র ফেলে ঐ সব অধিবাসীদের সাবধান করে দেওয়া হল, শীঘ্রই প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ শুরু হবে। এই ভাবে পর পর আরও কয়েকটি শহরকে সাবধান করে দেওয়া হল। সাবধান করার পরই ঝাঁকে ঝাঁকে সুপার ফর্ট্রেস বিমান থেকে বোমাবর্ষন আরম্ভ হল।

শেষ বারের মতো সাবধান করা হল ৫ আগষ্ট, জাপানকে নিরস্ত্র হতে বলা হল, যুদ্ধ থামাও, বোমাবর্ষণ বন্ধ হবে। জাপান সে কথা শোনে নি।

৬ আগস্ট ১৯৪৫ তারিখে হিরোশিমার ওপর অ্যাটম বোমা পড়ল। ট্রুম্যান তখন জাহাজে চেপে বাড়ির পথে অ্যাটলান্টির পার হচ্ছেন। জাহাজে বসে রেডিও মারফত খবরটা পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীদের খবরটা জানিয়ে দিলেন।

নির্মম অ্যাটম বোমার আঘাতে জগৎ যখন স্তম্ভিত তখন সেই জাহাজে আনন্দ কলরোল উঠল, শুরু হল পানোৎসব।

মার্কিনদের উদ্দেশ্য যেন সফল হল। রাশিয়া এবার চীন বা জাপানের দিকে হাত বাড়াবে না। রাশিয়ার ত অ্যাটম বোমা নেই। অ্যাটম বোমা ফাটানোর এটাও কি একটা উদ্দেশ্য।

হিরোশিমার পর নাগাসাকি। আশ্চর্য! সেই ভয়াবহ দৃষ্টান্তের পরও অ্যাটম বোমা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। তৈরি হয়েছে হাই-ড্রোজেন বোমা, নিউট্রন বোমা।

স্পাই টানেল নিয়ে এই কাহিনীর আরম্ভ আর সেই স্পাই

টানেলের আইডিয়া পর মাথায় এসেছিল সেই উইলিয়ম কে হার্ডে কিছুদিন আগে ৬০ বছর বয়সে হার্ট অ্যাটাকের ফলে মারা গেছে।

বিল হার্ডে নামেই সে পরিচিত ছিল। জার্মানিতে তাকে আট বছর রাখা হয়েছিল। স্পাই টানেল ফাঁস হয়ে যাবার পর জার্মানিতে রাশিয়ানদের কার্যকলাপের প্রতি নজর রাখা ছিল তার কাজ। তারপর ১৯৬০ সালে তাকে অ্যামেরিকায় ফিরিয়ে আনা হয়। কেনেডি প্রেসিডেন্ট হবার পর তার ওপর বিরাট একটা কাজের ভার দেওয়া হয়।

কেনেডি স্থির করেন যে কিউবার রাষ্ট্রনায়ক ফাইডেল ক্যাস্ট্রোকে তিনি ধ্বংস করবেন। এজন্যে গোপন একটা প্ল্যান তৈরি হয় যার নাম 'অপারেশন মঙ্গুজ'।

অপারেশন মঙ্গুজকে সফল করতে হলে পর্দার অন্তরালে কিছু কাজ করা দরকার। প্রধান হল খাস কিউবা থেকে গুপ্ত খবর সংগ্রহ করা এবং সেদেশে স্যাবোটাজ করা। এজন্যে গঠিত হল 'টাস্ক ফোর্স ডব্লু'। এই সংগঠনের ভার দেওয়া হল বিল হার্ডের ওপর। কিউবাতে যেয়ে মার্কিন নীতি প্রচারের আড়ালে থেকে সে গুপ্ত খবর সংগ্রহ করবে আর বিমানঘাঁটি, জাহাজের ডক ও কলকারখানায় স্যাবোটাজ করবে।

বিল হার্ডে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিল। কিউবাতে তার দশটি দল কাজ করছিল। কিন্তু হঠাৎ অ্যাটর্নি জেনারেল প্রেসিডেন্টের ভাই রবার্ট কেনেডি বিল হার্ডের কাজে কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করেন। বিল হার্ডেকে কিউবাতে কাজ করবার জন্যে কেউ নাকি সরকারী ভাবে অর্ডার দেয় নি। অতএব বিল হার্ডেকে ডেকে পাঠান হয়।

এরপর তাকে পাঠান হল বোম্বে, সি আইএ-এর স্টেশনে চিফ করে। হার্ডে যেতে চেয়েছিল লাওস। যেতে চেয়েছিল বলেই হয়ত তাকে পাঠান হল না।

প্রেসিডেন্ট কেনেডি মারা যাবার পর একটা প্রশ্ন উঠেছিল যে

তিনি কি ক্যাস্ট্রোকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলেন? কেনেডি কি এজন্যে পরোক্ষভাবে মাফিয়ার সাহায্য চেয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বার করবার জন্যে ইউ এস সিনেট ইনটেলিজেন্স কমিটির বৈঠক বসেছিল ১৯৫৫ সালে, জুন মাসে। প্রধান সাক্ষী ছিল বিল হার্ডে।

বিল হার্ডের অনেক গুণ ছিল, রিভলভারের দারুণ ভক্ত ছিল কিন্তু প্রধান দোষ ছিল ঘন ঘন মদ্যপান তবে মাতাল হত না।

এই অতিরিক্ত মদ্যপানই তাকে মারল। তাকে হাসপাতালে অনেক দন কাটাতে হল। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসবার পর তাকে চাকরি থেকে অবসর নিতে হল। ১৯৫৬ সালের জুন মাসে তার মৃত্যু হয়। আশা করা গিয়েছিল তাকে কবর দেবার সময় বেশ ভিড় হবে কিন্তু তা হয় নি। পাঁচের ও ছয়ের দশকে বিল হার্ডে ছিল সি আই এ-এর সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত চরিত্র। দেশ সেবার জন্যে বা তার কৃতিত্বের জন্যে যথোপযুক্ত পুরস্কার সে পায় নি।

শেষ